কাজের বই।

বা

বাস্তব উন্নতির প্রকৃত পথ-চিন্তা।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।"

গীতা।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৺শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

উৎসর্গ।

প্রতাপ! মহারাণা!

আজ তুমি কোথায়? আজ হল্‌দীঘাটা নাই, আকবর নাই, মানসিংহ নাই চৈতক নাই—কিন্তু তোমার জয়-গীতিতে হিমালয় হইতে কুমারিকা প্রতিধ্বনিত। জীবন স্থায়ী নয়—কিন্তু কীর্ত্তি স্থায়ী। "কীর্ত্তি র্যস্য স জীবতি" এই মহাবাক্য অক্ষরে অক্ষরে তোমার জীবনে প্রতিভাত হইয়াছে। তুমি যে ভারত দেখিয়া গিয়াছিলে আজ আর তাহা নাই। কিন্তু তোমার কীর্ত্তি অবিনশ্বর। প্রতাপ! আশীর্ব্বাদ কর, এই দীনহীন আমরা যেন তোমার চরিত্রের কণামাত্রও আহরণ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারি।

ভক্তি প্রণত

গ্রন্থকার।

নিবেদন।

১৩১১ সালের চৈত্র মাসে পুস্তক লিখিত হয়। কিন্তু নানা কারণে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিবার সুবিধা হয় নাই, সময়ের গতি অনুসারে ইহাতে নূতন করিয়া সংযোগ বিয়োগও করিতে হইয়াছে—কিন্তু বিষয়টী এতই গভীর ও মহান, ইহার আয়তন ও বিস্তৃতি এই সুদূরব্যাপী, আরও ইহা এতই বিভিন্ন ভাবে আলোচিত হইতে পারে যে মতদ্বৈধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমরা যে ইহা সঠীক ভাবে আলোচনা করিতে সক্ষম হইব, ইহা একবারও ভাবি না। তবে আমরা নিজে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি,—তাহাই সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম মাত্র। ইষ্টানিষ্ট সাধারণে বিচার করিবেন।

এরূপ পুস্তকের আদর, আমাদের নাটক নভেল প্লাবিত দেশে হয় কি না হয় সন্দেহে "দীনবন্ধুর" রামায়ণ বলার মত এক নিশ্বাসেই শেষ করিয়া দিলাম। যদি আবশ্যক হয় বারান্তরে প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

পরিশেষে—গীতাপ্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার ব্যক্তিগত ভাবে কিছু না বলিবার থাকিলেও হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে। ইনিই প্রথম চারি আনার গীতা প্রকাশ করিয়া

সর্ব্ব সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। পরন্তু গীতালব্ধ যাবতীয় আয়স্বত্ব কোন একটি স্কুলে দরিদ্র ছাত্রগণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রদান করিয়াছেন। কি সুন্দর স্বার্থত্যাগ! আমরা হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি ভগবান তাঁহাকে সুস্থদেহে রাখিয়া আর্য্যধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী প্রকাশের সুযোগ প্রদান করুন। আপাত ইতি—

অম্বগ্রাম, কেতুগ্রাম,
বর্দ্ধমান,
তাঃ ১লা আশ্বিন। ১৩১৪

নিবেদক
শ্রীঅশ্বিনীকুমার—
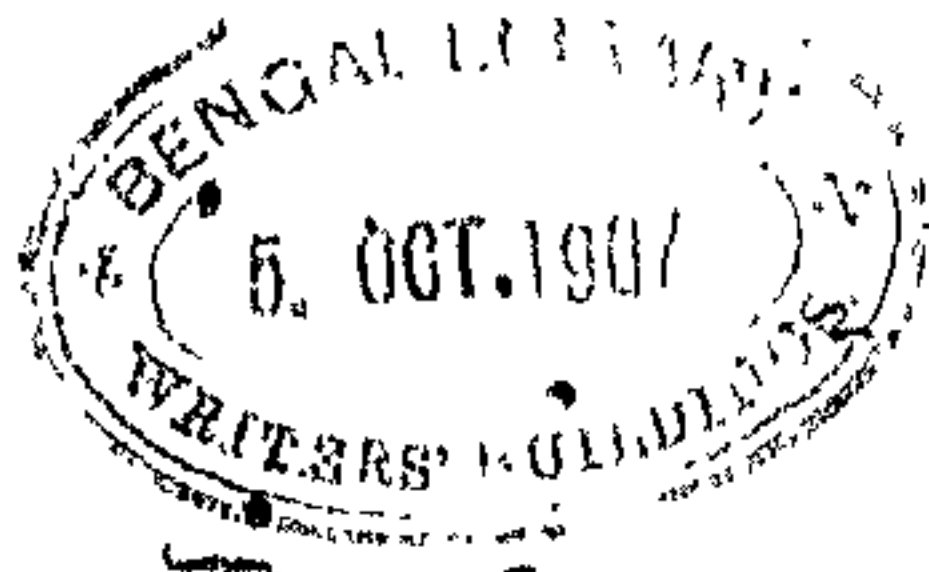
কাজের বই।

সূচনা।

আমরা বোধহয় সকলেই জানি মানব মাত্রেই উন্নতি-মার্গে আরোহণার্থ যত্নশীল। মানব মাত্রেরই নিজের উন্নতি-কামনা করা স্বাভাবিক। কেহ কখনও আপনাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করে না। একজন সামান্য ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ক্রমানুসারে সকলেরই উন্নতির ইচ্ছা বলবতী দেখা যায়। স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি নীতির অনুসরণে, সকলেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে। একজন মজুর ইচ্ছা করিতেছে, 'আমি ধনবান হইব'; রাজা ভাবিতেছেন, 'কেমন করিয়া রাজাধিরাজ হইতে পারি'। ইঁহারা হয়ত অর্থোপার্জ্জন বা অর্থসঞ্চয়কেই জীবনের চরম উন্নতি বিবেচনা করিয়া, সেই উদ্দেশ্য সাধনেই যত্নশীল। 'স্বামী' হয়ত পরমহংস হওয়াকেই জীবনের চরম উন্নতি বিবেচনা করিয়া, সেই লক্ষ্য সাধনেই স্বকীয় সমস্ত শক্তি ন্যস্ত করিয়াছেন। অন্যভাব—দারিদ্র্যদুঃখ-বিমোচন, অত্যাচার নিবারণ; প্রকৃত দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি গুণ সকল তাঁহার নাই। * অবশ্যই তিনি আমাদের পূজ্য এবং

* আধুনিক সন্ন্যাসীই বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

প্রণম্য। * কিন্তু এই সকল গুণাবলীর অপ্রকাশ হেতু আমরা তাঁহাকে 'সর্ব্বগুণান্বিত' বা 'পূর্ণমনুষ্য' বলিতে পারি না। সকলেরই এইরূপ কোন না কোন স্থলে অপূর্ণতা বিদ্যমান। প্রকৃত উন্নতি-শিখরে আরোহণ করা বড়ই দুরূহ। বহু সাধনা না করিলে মানব এ সাধনায় সফলকাম হইতে পারে না। তবে চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পথে অগ্রসর হইলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। এখন উন্নতি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? এবং কোন পথ অবলম্বন করিলে আমরা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি, এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাউক।

উন্নতি কি?

দুঃখের অভাবই সুখ। † "দুঃখ" তিন প্রকার; (১) আধ্যাত্মিক—ইহা দ্বিবিধ; শারীরিক ও মানসিক; বাতপিত্ত-কফের ব্যতিক্রমজাত জ্বরাদিরোগের নাম শারীরিক দুঃখ; স্ত্রী

* ধর্ম্মের ভান মাত্রও ইহাতে আছে বলিয়া।

† ন্যায়ের গভীর তর্কে বস্তুতঃ তাহা না হইলেও, মোটামুটি ইহা ধরিয়া লইলে বিশেষ কোন দোষ হইতে পারে না। যাহার সুখের জ্ঞান আছে তাহার দুঃখের জ্ঞান অবশ্যই আছে, আর যাহার দুঃখের জ্ঞান আছে তাহারও সুখের জ্ঞান অবশ্যই আছে। এই দুইটী এতই গভীরভাবে সংযুক্ত যে, বিচ্ছিন্ন করা না করা সমান। আর এই উভয়েরই কিম্বা যে কোন একটার অতীত অবস্থাই সমাধি (কারণ ইহাদের একের বিনাশ হইলেই অপরের বিনাশও অবশ্যম্ভাবী)।

পুত্র ধনাদি প্রিয় পদার্থের বিয়োগ বা কলঙ্ক প্রভৃতি অপ্রিয় ঘটনার নাম মানসিক দুঃখ ; (২) আধিভৌতিক—ব্যাঘ্র, চৌরাদি জনিত দুঃখ ; (৩) আধিদৈবিক—জল, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি জনিত দুঃখ।

এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে যিনি আপনাকে যতদূরে রাখিতে পারিয়াছেন, তিনি তত পরিমাণে উন্নতি করিয়াছেন। যাঁহার উপরে দুঃখের আধিপত্য যত কম, তিনিই তত অধিক পরিমাণে 'সুখী' বা 'উন্নত'।

উন্নত হইবার প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় 'সদ্‌গুণাবলম্বন'। মানব একমাত্র সদ্‌গুণাবলী অবলম্বন করিয়াই সফলকাম হইতে পারে। অন্য কিছুতেই তাহাকে প্রকৃত উন্নত করিতে কদাচ সক্ষম নয়।

উন্নতি শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া আমরা সংজ্ঞা স্বরূপ নিম্নলিখিত সূত্রটি প্রাপ্ত হইতে পারি।

[{ শিক্ষা ‖ চরিত্র ‖ একতা } + "ধর্ম্ম"] = "উন্নতি"।

শিক্ষা হইতে চরিত্র, চরিত্র হইতেই একতার উৎপত্তি ; এবং এই সকলের সহিত ধর্ম্ম সম্মিলনই প্রকৃত উন্নতি নিদান।

"শিক্ষা।"

শিক্ষা হইতেই মানব চরিত্রের বিকাশ। শিক্ষাই জীবনের প্রথম এবং প্রধান অবলম্বন। বাল্যের শিক্ষাই জীবনের শিক্ষা। বাল্যকালে যে ভাব অঙ্কুরিত হয়, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহারই কার্য্য হইয়া থাকে। সেইজন্য শৈশবেই যাহাতে 'সত্যানুরাগ,' 'আত্মসংযম' 'ন্যায়পরায়ণতা' 'সরলতা' 'দৃঢ়তা' 'সহিষ্ণুতা' 'স্বদেশহিতৈষিতা' 'নিস্বার্থপরতা' 'পরোপকারিতা' 'স্বাবলম্বন' ইত্যাদি সদ্গুণাবলীর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা, ও 'কপটতা' 'নিষ্ঠুরতা' প্রভৃতির প্রতি ঘৃণা জন্মে, সেইরূপ শিক্ষাদানই প্রকৃত শিক্ষা।

শিক্ষা ত্রিবিধ;—মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তি-বিষয়ক, এবং শারীরিক। সাময়িক শিক্ষা বলিয়া আরও এক প্রকার শিক্ষা আছে, ইহা মূলতঃ এই ত্রিবিধ শিক্ষারই অন্তর্নিবিষ্ট। মনই আমাদের 'প্ররোচক শক্তি'। মন যদি উন্নত হয়, তাহা হইলে কার্য্যাবলীও নিঃসন্দেহ উন্নত হইবে। মনের বলই প্রকৃত বল। মনঃশক্তির গতি অপ্রতিহত। বাবর ও হুমায়ুনের বৃত্তান্ত ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মনের তেজ না থাকিলে কেহ কখনও 'সর্ব্বগুণান্বিত' হইতে পারে না। যাবতীয় কার্য্যই মনঃ-সাপেক্ষ। সেই জন্য মন উন্নত করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। দস্যু রত্নাকরের মন উন্নত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি মহামুনি বাল্মীকি বলিয়া খ্যাত হইতে পারিয়াছেন। মন উন্নত করিতে হইলে প্রধানতঃ নীতিই

অবলম্বন। নীতি শিক্ষাই হৃদয়স্থিত কলুষ-কালিমা ধৌত করিয়া, ধর্ম্মভাব প্রণোদিত করিয়া, এই সর্ব্বথা-ভ্রষ্ট মানবকে দেব-সিংহাসনে স্থাপিত করিতে সমর্থ। চরিত্রই একমাত্র বিচার্য্য। নীতি দেখিয়াই মানবের চরিত্র অবধারিত হইয়া থাকে। অন্য যতই—কি শারীরিক, কি বুদ্ধিবৃত্তি-বিষয়ক —গুণাবলী থাকুক না কেন, একমাত্র নীতির অভাবে সমস্তই বৃথা। একজন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ, অথবা কাব্যতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদি সংস্কৃত উপাধি-প্রাপ্ত, কিন্তু হয়ত লম্পট, মদ্যপায়ী, বিশ্বাসঘাতক। একমাত্র জীবনে সুনীতির সমাবেশের অভাবে ইঁহাদের সমস্তই বৃথা নয় কি?—এরূপ শিক্ষায় কোন ফল নাই। সত্য বটে, হয়ত ইঁহারা অর্থোপার্জ্জনক্ষম, কিন্তু সেই অর্থই তাঁহাদের বিনাশের হেতুস্বরূপ; অপিচ শুধু অর্থোপার্জ্জনই ত জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। যিনি নিজের জীবনে সুনীতির সমাবেশ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ, তিনিই ধন্য।

নীতি সংখ্যায় অনেক। এখন যেগুলি সর্ব্বাগ্রে সাধনীয় তন্মধ্যে গুটিকতকের উল্লেখ করা যাইতেছে মাত্র।

১। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি।

২। সদা সত্যকথন।

৩। সাধুতা ও ইন্দ্রিয় সংযম।

৪। লোভ সংবরণ।

৫। হিংসা না করা;—সকলকে ভালবাসা,—স্বার্থত্যাগ।

৬। সৎকার্য্য মাত্রেরই প্রশংসা করা, এবং সৎকার্য্যে উৎসাহ দেওয়া। সকলকেই উপযুক্ত সম্মান করা।

৭। যাহা করিতে হইবে, তাহা ধীরে অথচ সত্বরে এবং সম্পূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ভাবে সম্পাদন করাই উচিত।

৮। অসাময়িক কার্য্য না করা।

ইত্যাদি,—ইত্যাদি—

মানসিক শক্তিই শারীরিক শক্তিকে কার্য্যকরী করে। মনই মূলাধার। মন উন্নত করিবার উপায় সুনীতি। আর, একাগ্রভাবে তাহাতে সম্বদ্ধ থাকাই নীতি সাধনের মূলমন্ত্র। ইহা ব্যতিরেকে নীতি-সমাবেশ কদাচ সম্ভবপর নয়। নীতি সংগ্রহ এবং শিক্ষার উপাদান—'নীতি পুস্তক,' 'জীবনচরিত,' 'ইতিহাসাদি' অধ্যয়ন। ইহাতে হৃদয় একাধারে বিমলানন্দ ভোগ করে, এবং উচ্চাশা, প্রাচীন ইতিহাস, লোক চরিত্রাদি বিষয়ক বিবিধ জ্ঞানে মণ্ডিত হইতে থাকে; অপিচ সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রহ এবং অভ্যাস হইয়া যায়। কিন্তু শুধু জ্ঞাত হইলেই কোন বিশেষ ফল হয় না।—নিজেব কর্ম্মজীবনে অধীত গুণরাশি সমাবেশ করিয়া প্রতিফলিত করাই প্রকৃত কার্য্য।

"বুদ্ধিবৃত্তি-বিষয়ক শিক্ষা।"

যাহা কোন বস্তুর নিশ্চয়তা এবং যথার্থতা সম্বন্ধে মনোমধ্যে দৃঢ় ধারণা করাইতে সক্ষম, তাহাই বুদ্ধি। যে জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিপরিচালন দ্বারা জন্মে, তাহাই বুদ্ধিবৃত্তি-বিষয়ক।

এই শিক্ষাই মানবের ঐহিক আশা পূরণে সমর্থ। এই শিক্ষাই মানবকে পার্থিব যোগ্যতা লাভে সমর্থ করে। সংসারে বাস করিতে হইলে, সকল বিষয়েই প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক ; নচেৎ কষ্ট অবশ্যম্ভাবী, এবং মানবসাধ্য সম্পূর্ণতাও লাভ করা যায় না। এখন দেখা যাউক কোন্ কোন্ গুণাবলী থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

১। কৃষিকার্য্য।

২। অঙ্কবিৎ হওয়া।......অন্ততঃ শুভঙ্করী সমস্ত।

৩। সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন হস্তলিপি।

৪। ভাষা জ্ঞান—মাতৃভাষা ; ইংরাজী ; শাস্ত্রভাষা ; এবং হিন্দী। (অন্ততঃ এই কয়টি ভাষায়, বিশুদ্ধরূপে লিখন, পঠন, এবং কথা কহিবার সামর্থ্য।) (শাস্ত্রভাষা—যেমন হিন্দুদের সংস্কৃত, মুসলমানদের পারসী এইরূপ)।

৫। নাম, বিষয়, জিনিষ, তাহার উপযুক্ত ব্যবহার ইত্যাদি যথাযথ স্মরণ রাখা।

৬। পাঠ করিবার, কথা কহিবার, এমন কি স্বরেরও সাধন আবশ্যক।

৭। অন্যান্য জাতির আচার ব্যবহারাদি তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে জ্ঞান ;—ইত্যাদি।

৮। অর্থনীতি—অর্থের উপার্জ্জন, ব্যয় এবং সঞ্চয় বিষয়ে জ্ঞান।

৯। আইন জ্ঞান।

১০। জ্যোতিষ।...সামুদ্রিক, ফলিতাদি।

১১। ধাতু পরীক্ষা।

১২। যাবতীয় অস্ত্রের ব্যবহার প্রণালী।

১৩। সূত্রধর, কর্ম্মকার এবং টিনওয়ালাদের কার্য্য।

১৪। সূচীবিদ্যা।

১৫। রাজমিস্ত্রি ও ঘরামির কার্য্য।

১৬। সৌন্দর্য্য জ্ঞান।

১৭। পদ্য, গদ্য, গীত ইত্যাদি বিষয়ে রচনা জ্ঞান।

১৮। সঙ্গীত শাস্ত্র .....গীত, বাদ্য নৃত্যাদি।

১৯। শিক্ষাদান প্রণালী।

২০। উপবেশন প্রণালী।

২১। আহার করিবার প্রণালী।

২২। শৌচাদি প্রণালী।

২৩। রন্ধন জ্ঞান।

২৪। রতি শাস্ত্রে জ্ঞান।

২৫। বসনভূষণশয্যাদি জ্ঞান।

২৬। চিত্রাঙ্কণ।

২৭। যাবতীয় ক্রীড়াসমূহে পটুতা।

২৮। বৈজ্ঞানিক প্রকরণ—(যেমন সাবান ইত্যাদি)।

ইত্যাদি, ইত্যাদি—

কতকগুলি দেওয়া হইল মাত্র। অবশিষ্ট এখনও অনেক। যাহা হউক, যে কয়টি দেওয়া হইয়াছে, ইহাই উপযুক্তভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলেই একরূপ যথেষ্ট।

নিজের দোষ সংশোধন করিতে হইলে, দেখা উচিত কোন্ কোন্ গুণ বা দোষ আমার আছে এবং নাই। যে গুলি বেশ ভাল ভাবে জানি, যে গুলি আংশিক জানি, যে গুলি মোটেই জানি না তৎসমুদায়ের আলোচনা করিয়া, প্রথমে যে গুলি আংশিক জানি, তৎপরে যে গুলি মোটেই জানি না, তাহাই সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করাই সমীচীন।

সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে কোন কথা লিখিত হইবার আবশ্যক নাই। ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

"শারীরিক শিক্ষা।"

যেমন জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা মন, তেমনি ব্যায়ামচর্চ্চা দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে। মন ও শরীর এতই ঘনিষ্ঠ ভাবে সংবদ্ধ যে, একের অসুস্থতায় অন্যের অসুস্থতা অবশ্যম্ভাবিনী। শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ থাকে। শরীর ও মন উভয়েরই যোগে এই দেহ। দেহ সুস্থ না থাকিলে, কোন বিষয়ই ভাল লাগে না এবং কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।

শারীরিক শিক্ষা শরীর-সম্বন্ধীয়। ব্যায়াম-চর্চ্চাই শরীর সুস্থ রাখিবার প্রধান উপায়। ব্যায়াম দ্বারা শরীর দৃঢ় হয়, স্বেদ জল নির্গত হয়, ক্ষুধা বর্দ্ধিত হয়, এবং দেহকান্তি

বৃদ্ধি হয়,—নিয়মিত এবং পরিমিত ব্যায়ামে এতই উপকার। কিন্তু অনিয়মিত এবং অপরিমিত ব্যায়ামে শরীর সুস্থ থাকা দূরের কথা, শীঘ্রই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। সকল বিষয়েরই একটি নির্দ্দিষ্ট সময় ও পরিমাণ থাকা একান্ত আবশ্যক; নচেৎ যখন তখন যা' তা' করা একেবারেই অনুচিত। তাহাতে সুফল লাভ ত হয়ই না, অধিকন্তু কার্য্যটিও পণ্ড হয় মাত্র। উপযুক্ত ব্যায়াম যেমন হিতকর, উপযুক্ত বিশ্রামও তদ্রূপ। বিশ্রাম দ্বারা শরীর নব বলে বলীয়ান হয়। শরীর সুস্থ থাকিলে, হঠাৎ কোন ব্যাধি কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। দিন দিন আমাদের দেশে যেরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে উপযুক্ত ব্যায়াম যে আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই একান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এখন দেখা যাউক, কিরূপ ব্যায়াম আমাদের উপযুক্ত। বোধ হয়,—

১। দৌড়ান।

২। উল্লম্ফন।

৩। ক্ষেত্রলম্ফন।

৪। ঊর্দ্ধ হইতে লম্ফন।

৫। বৃক্ষাদিতে আরোহণ ও অবরোহণ।

৬। অশ্বাদিতে আরোহণ।

৭। সন্তরণ—নৌকাদির কর্ণধারণ।

৮। লাঠিখেলা—লক্ষ্যভেদ—কুস্তিখেলা।

এই কয় প্রকার ব্যায়ামই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। লাঠিখেলা অতি সুন্দর ব্যায়াম—ইহাতে শরীরের ও মনের উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, বিপদ কালে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়, এবং হঠাৎ বিপদে প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকে না।—এখন আমাদের এই প্রকার ব্যায়ামেরই একান্ত প্রয়োজন বলিয়া অনুমিত হয়।

যেমন সুস্থাবস্থায় ব্যায়াম চর্চ্চা দ্বারা শরীরের পোষণ হয়, তেমনি অসুস্থাবস্থায় যে শিক্ষা দ্বারা পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করা যায়, সে তাহাও শারীরিক শিক্ষার অন্তর্নিবিষ্ট। অবশ্য সকলকেই যে চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইতে হইবে, এমন নহে ; তবে এ বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান প্রত্যেকেরই থাকা আবশ্যক। ইহাতে প্রভূত উপকার ; প্রথমতঃ—হঠাৎ কোন বিপদাপদ উপস্থিত হইলে, চিকিৎসকের সাহায্যগ্রহণের পূর্ব্বেই অনেকটা প্রতিকার করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ—সামান্য অসুখ উপস্থিত হইলে, অনর্থক চিকিৎসার গুরু ব্যয়ভার হইতে মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে। আরও মনে আত্মপ্রসাদ ও স্বকীয় শক্তির উপর নিজের বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইয়া থাকে। এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক ; এলোপ্যাথিক ঔষধ আমাদের পক্ষে বিশেষ হিতকর নহে। এখন যে এত ঘন ঘন পৌনঃপুনিক ভাবে জ্বর ও শরীর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে, এলোপ্যাথিক ঔষধ সেবনই তাহার অন্যতম কারণ। আমাদের এ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এলোপ্যাথিক

ঔষধে পরোক্ষভাবে শরীরের ধ্বংস সাধন করিবেই করিবে। আমাদের পক্ষে কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই সম্পূর্ণ উপযোগী। এলোপ্যাথিক কখনই নয়।

যাহা হউক,—স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানাদির নিয়ম প্রতিপালন; চিকিৎসা শাস্ত্রে অত্যাবশ্যক সাধারণ জ্ঞান, এবং এই সকলের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পাদনই যে শরীর সুস্থ রাখিবার প্রধান উপায় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

"সাময়িক শিক্ষা।"

[পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই শিক্ষা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ শিক্ষা-রই অন্তর্নিবিষ্ট।]

দেশের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, শাসন প্রণালী আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি অনুশীলন করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। এখন দেখা যাউক, কি প্রণালীতে আমাদের চলা উচিত।

কতকগুলি গৃহের সমষ্টি লইয়া গ্রাম; গ্রামের সমষ্টি লইয়া জেলা; জেলার সমষ্টিতে প্রদেশ এবং প্রদেশের সমষ্টিতেই দেশ। এখন যদি প্রত্যেক গৃহেরই হিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই সমস্ত দেশের হিত হইয়াছে; তাহা যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিছুই হয় নাই। যদি গৃহের হিত হওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে গৃহের সকলেরই একমতাবলম্বী হওয়া আবশ্যক। মতদ্বৈধ থাকিলে সংসারের হিত হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। বাধ্য হইয়া, অবনত-

মস্তকে গৃহকর্ত্তার আদেশ পালন ব্যতিরেকে সংসারের হিত কদাচ হইতে পারে না। কি বিদ্যালয়ে, কি বাণিজ্যালয়ে, কি সৈন্যশ্রেণীতে কি সাংসারিক কার্য্যে "মণ্ডলের" আদেশ পালন ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। সকলেরই একবাক্য হওয়া চাই-ই চাই। তাহা যদি না হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিশৃঙ্খল হইবে। কিন্তু, এরূপ বিশৃঙ্খল হইবার মূল কারণ কি?—শিক্ষা। গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি উপযুক্তভাবে, শিক্ষিত শিক্ষিতা হইতেন, তাহা হইলে সংসারের এরূপ বিশৃঙ্খলা হইবার কোন কারণ না থাকারই সম্ভব ছিল। ["অমুক স্ত্রীলোকটি শিক্ষিতা" এ কথায় আমি বি এ, এম এ, পাশ বুঝি না; যে স্ত্রী, গুরুজনে ভক্তি করিতে, সমানে ভালবাসা প্রদর্শন করিতে, দেবরাদিকে সন্তান তুল্য জ্ঞান করিতে, এবং অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করিতে সমর্থ; যিনি প্রতিবেশীর সুখ দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ অনুভব করেন, প্রার্থীর কাতরতা পূর্ণ আকৃতি দেখিয়া যিনি অশ্রুসংবরণে অসমর্থ হইয়া পড়েন; যাঁহার হৃদয় ন্যায়-পরায়ণতা, সহিষ্ণুতা, সত্যানুরাগ, ধর্ম্মানুরাগ, লজ্জাশীলতা ইত্যাদি যাবতীয় সদ্‌গুণাবলীর আধার, এবং যিনি সদা সাংসারিক কার্য্যপরায়ণা তিনিই শিক্ষিতা। আমি শিক্ষিতা বলিতে ইহাই বুঝি। আজ যিনি বালিকা কন্যা তিনিই হয়ত একটি বৃহৎ সংসারের কর্ত্রী হইবেন। তাঁহারই সন্তানগণ তাঁহারই নির্দ্দেশানুমত পথ অবলম্বন করিবেন। আধুনিক

শিক্ষিতা কুলললনাগণের মধ্যে যাঁহারা ধনবানের গৃহ অলঙ্কৃত করিতেছেন, তাঁহাদেব অনেকেই কার্পেট বয়ন প্রভৃতি সৌখীন কার্য্যে অথবা কৌতূহলোদ্দীপক-অকিঞ্চিৎকর অথচ আপাতমনোরম নাটকনবেলাদি পাঠে সময়াতিপাত করিয়া থাকেন; গৃহকর্ম্ম এবং সন্তান পালনরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয়—অপরিহার্য্য কার্য্য সকল দাসদাসী, পাচকপাচিকা বা ধাত্রীর উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। বেতনভুক্ ভৃত্যগণ যে তাঁহাদের স্বসম্পাদ্য কার্য্যাবলী সুসম্পাদনে সম্পূর্ণ অযোগ্য একথা তাঁহারা ভ্রমেও মনে করেন না। পাচকপাচিকা কেবল মাত্র বেতনসম্বন্ধে সম্বন্ধ। খাদ্যের বিশুদ্ধি সম্পাদনে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। স্বয়ং তত্ত্বাবধান না করিলে খাদ্য দ্রব্য কদাচ স্বাস্থ্যজনক হইতে পারে না। ধাত্রী বা দাসদাসীর হস্তে সন্তান পালনের ভার দিলে কি সন্তানগণের প্রাথমিক শিক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে? সন্তানগণ মাতৃস্তন্যের সহিত যে শিক্ষা লাভ করে, তাহাই তাহাদের শিক্ষার ভিত্তি। এই ভিত্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে পারিলে উত্তরকালে তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। এ সম্বন্ধে মাতা অসাবধান হইলে সন্তানগণ কদাচ মানুষ হইবে না। দুঃখের বিষয়—মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের কুলবধূগণও যথাসাধ্য ধনি মহিলা-গণের অনুকরণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছেন। ইহার ফল দুঃখ দারিদ্র্য অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করিয়া সংসার ছারখার করিতেছে। এই সব কারণেই বলিতেছি আধুনিক

কুলললনাগণের অধিকাংশই শিক্ষিতা নন পরন্তু সম্পূর্ণ কুশিক্ষিতা। আমি অবশ্যই কার্পেট বয়ন প্রভৃতি যে একব্যারেই মন্দ কাজ তাহা বলিতেছি না। সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া অবসর সময়ে ওসব করিলে কিছুই ক্ষতি নাই; কিন্তু সদা সর্ব্বদা ঐসকল লইয়া ব্যস্ত থাকা কি উচিত?

পূর্ব্বকালে স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা, করিয়া এত ধুম ধাম ছিল না, কিন্তু কুলকামিনীগণ দেখিয়া শুনিয়া অল্পাধিক পরিমাণে আপনা হইতেই, সকল রকম সুশিক্ষাই নিজের জীবনে সমাবেশ করিতে পারিতেন। তখন গৃহিণীপণা শিক্ষাই স্ত্রীলোকের ভূষণ স্বরূপ ছিল। এখনও অতিবৃদ্ধারা সামান্য অসুখে চিকিৎসকের আবশ্যকতা রাখেন না। আপনারাই ঔষাধাদি প্রয়োগে সামান্য সামান্য রোগের প্রতীকার করেন। কিন্তু সে দিন ক্রমেই ফুরাইতেছে;—হায়! আবার আসিবে কিনা কে বলিতে পারে?] যাক্, এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই আরম্ভ করি। রীতি নীতি আচার ব্যবহারাদি শিক্ষা করা যেমন আবশ্যক; আর্থিক সচ্ছলতা, অসচ্ছলতার প্রতি দৃষ্টি রাখাও তেমনি আবশ্যক। আমাদের দেশ দুর্ভিক্ষ পীড়িত, দরিদ্র; তাই আমরা আগে অর্থের কথা বলি, পরে অন্যকথা বলিব।

জীবন ধারণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই আহারের প্রয়োজন। যদি আহার্য্যের অসদ্ভাব হয় তাহা হইলে আমাদের কোন গুণই পরিস্ফুট হইতে পায় না। অন্য কোন জিনিষ না হইলে বরং চলে, কিন্তু মোটা ভাত, মোটা কাপড় ব্যতীত এক

দণ্ডও ত চলিবার উপায় নাই। মানুষ প্রধানতঃ দুই প্রকারে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে; প্রথমতঃ—কৃষিকার্য্য দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ—বাণিজ্য, দাসবৃত্তি ইত্যাদির দ্বারা। কেহ কেহ বা উভয়বিধ কার্য্য দ্বারায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আবার অনেকে এমন আছেন "চাকরী করা মানের কাজ" ভাবিয়া, নিজের উৎকৃষ্ট অবস্থা সত্ত্বেও পরের দাসত্ব করিতে প্রবৃত্ত হ'ন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প,—এমন কি, ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। এখন সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখা যাউক, এই সুজলা সফলা আমাদের মাতৃভূমি কেনই বা দিন দিন এত দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে; আর কি করিলেই বা পূর্ব্বগৌরব লাভ করিতে পারে।

কৃষিজীবীদের আয় মোটামুটি মন্দ নয়; কিন্তু তথাপি তাহাদের অবস্থা ভাল নয়। সামান্য কারণেই তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। আর 'দ্বিতীয়শ্রেণী' লোকের আয় নিতান্তই স্বল্প, * তাহার উপর আবার কৃষিজীবিদের অপেক্ষা

---

* অবশ্যই বাণিজ্যজীবীদের তাহা নয়। ইঁহাদের আয় স্বচ্ছল। কিন্তু বাস্তবিক বাণিজ্য করে কয় জন। বাণিজ্য দ্বিবিধ—অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য। কিন্তু বহির্বাণিজ্য ত আমাদের একরূপ নাই বলিলেই হয়। যাঁহাদের সঙ্গতি আছে তাঁহারা কোম্পানীর কাগজের সুদ লওয়া ভিন্ন অন্য কিছু ভাবিবার আবশ্যকতা বোধ করেন না। কাজেই ইঁহাদের সংখ্যা এতই কম যে ইঁহাদিগকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে লওয়া না লওয়া সমান। খুব বড় বড় ধনী ব্যবসাদারদের কথা ছাড়িয়া দিলে প্রায় সমস্ত ব্যবসায়ীরই আয় খুব কম না হইলেও বেশী নয়।—অন্যান্যের, যাহার উপর যাঁর যত বেশী নির্ভর তিনি সেই শ্রেণীরই অন্তর্নিবিষ্ট।

ব্যয় বেশী; কাজেই উভয়বিধ লোকই ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। এ অবনতির কারণ মোটামুটি বলিতে গেলে—আহার্য্য দ্রব্যের রপ্তানি; করভার; আয়-স্বল্পতা; বিলাসিতা; মামলা মকর্দ্দমা; পুত্রকন্যার বিবাহ ইত্যাদি—[বিশেষ জানিতে হইলে, Digby's Prosperous India, শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেওস্করের 'দেশের কথা' ইত্যাদি পুস্তক পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক।]

দেখা যাউক, কি করিলে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ; কৃষিকার্য্যের উন্নতি করাই বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু তৎপক্ষে বিষম অন্তরায় ঘটিতেছে; প্রথমতঃ—ক্রমেই ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি হ্রাস হইতেছে। কোন কোন উপায় অবলম্বন করিলে তাহার উর্ব্বরাশক্তি পুনরায় বর্দ্ধিত হইতে পারে তাহার নির্ণয় করা এখনই প্রয়োজন। অস্থিচূর্ণাদি আধুনিক সার কিরূপ ভাবে কোন জমীতে ব্যবহার করা উচিত, তাহার পরিমাণ কি, ইত্যাদি বিষয় কোন কৃষিবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতের ধারাবাহিকরূপে হিতবাদী, বঙ্গবাসী আদি সর্ব্বজন সুপরিচিত সংবাদ পত্রে প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদরূপে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কোন্ কোন্ কৃষি যন্ত্রের কিরূপ পরিবর্ত্তন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইতে পারে, তাহার নির্ণয় করাও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় শত শত ছাত্র এনজিনিয়ারিং পাশ হইয়া গেল, কিন্তু কি খনন কার্য্যের, কি জলোত্তোলন

কার্য্যাদির কোনই বাস্তব হিতকর দেশোপযোগী যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়া কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিতে পারিল না। 'বাবুগণ' একটু হাতে কলমে চেষ্টা করিয়া দেখুন, ক্ষতি কি?

দ্বিতীয়তঃ—বিনা জলে কৃষিকার্য্য হয় না। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণ-প্রদত্ত জলাশয়গুলি ক্রমেই মজিয়া যাইতেছে। যাইবে না কেন? যদি কেহ বর্দ্ধিষ্ণু হইলেন, অমনই গ্রাম্যবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'সহরে' হইয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিলেই বলেন "ও ম্যালেরিয়া পরিপূর্ণ স্থানে বাস করা পোষায় না,"—ম্যালেরিয়া হয় কেন? পানীয় জল নাই কেন? পূর্ব্বপুরুষগণের বহু পূর্ব্বে প্রদত্ত, ক্ষুদ্রস্বার্থ বিবর্জ্জিত পুষ্করিণী-গুলির তোমরা থাকিতে এ দশা হইতেছে কেন?—হায়! হায়! কি ছিল, কি হইয়াছে? কোথায় হইতে আমরা কোথায় আসিয়াছি? সে নিস্বার্থ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিপ্রণোদিত জলাশয়াদির প্রতিষ্ঠা, ক্লান্ত পান্থের আতপ-তাপ নিবারণার্থ অশ্বত্থাদি বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা ভুলিয়া কেবল "অনন্ত, বালা, ঘোড়া, গাড়ী" লইয়া মত্ত থাকা কি ঋষিবংশধর হইয়া আমাদের শোভা পায়? ছিঃ!—এখন দৈব-নির্ভর না করিয়া, সর্ব্বাগ্রে এই সব জলাশয়েরই পঙ্কোদ্ধার করিয়া, স্থান বিশেষে বা নূতন নূতন জলাশয়াদির প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহাতে সেচনাদি কার্য্যের সুবিধা হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা কি গ্রামের জমীদার, গ্রামবাসী এবং রাজার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য নয়?

তৃতীয়তঃ—জমী ভাল করিয়া কর্ষিত না হইলে আহার

যোগাইবে কে? ভূমি কর্ষণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই ভাল গরুর প্রয়োজন। কিন্তু আজকাল বোধ হয়, বঙ্গদেশের গো বংশই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; কিন্তু বেশী নয় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। তখন বাঙ্গলার এক একটা ষণ্ড এক একটা হস্তীর ন্যায় ছিল। এ সব কথা নিখিল বাবুর 'সোণার বাঙ্গালা' পড়িলে বিশেষ বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু যা আছে, তাও বুঝি থাকে না,—ক্রমেই অবনত হইতেছে। এরূপ হইবার কারণ কি?—আহারাভাব। দেশের যত 'গোচর' ছিল জমীদার মহাশয়দিগের ও অদূরদর্শী স্বার্থপর ব্যক্তিদের অর্থলিপ্সায় প্রায় তৎসমুদয়ই এখন জমীতে পরিণত হইতেছে। কাঁচা ঘাসই গরুর প্রধান খাদ্য, কিন্তু তাহার অবস্থা ত ঐ; এ ক্ষেত্রে কি খাইয়া গরু জীবন ধারণ করিবে? জমীতে যে খড় উৎপন্ন হয়, প্রায় তৎসমুদয়ই চাষীকে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইতেছে। যে সরিষা উৎপন্ন হয়, অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হইতেছে,—এ রকম অবস্থায় 'খড় খোল' হয় কোথা হইতে। অবশ্যই হালের গরুর জন্য খড় খোলের ব্যবস্থা সুঅবস্থা সম্পন্ন চাষীদের বাটীতে কিয়ৎ পরিমাণে হইয়া থাকে, কিন্তু গাই গরুর জন্য সেরূপ ব্যবস্থা প্রায় কোন চাষীর বাটীতেই নাই। গাভী সতেজ না হইলে, উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ না জন্মিলে গোবংশের উন্নতি হইবে কোথা হইতে? "বাছুর" জন্য দুগ্ধ পাইবে কোথা? যে টুকু দুগ্ধ হয়, তাহাতে গৃহস্থরই সঙ্কুলান হয় না। গৃহস্থেরও সে

দিকে তাদৃশ লক্ষ্য রাখিবার অবকাশ নাই। তাঁহার নিজের শরীর, সন্তান সন্ততিদিগের শরীর রক্ষার নিমিত্ত একটুকু অন্ততঃ 'জলে থলে বাড়ানদুগ্ধ'ও চাই ত; কিন্তু যে টুকু হয় তা'ই পর্য্যাপ্ত নয়; কাজেই বাছুরের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার অবকাশ আর থাকে কৈ?—ক্রমে বাছুর আঁতমরা হইয়া যায়; তারপর যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময় হয়, তখনও ভালরূপ আহার পায় না, কাজেই দিন দিন ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। ষণ্ডের আর সেরূপ শক্তি নাই; তবে হিন্দুধর্ম্মের কৃপায় এখনও ষণ্ড একান্ত নিস্তেজ হয় নাই বলিয়াই রক্ষা। নচেৎ আজ বোধ হয়, গোবংশ ছাগল বংশে পরিণত দেখিতে হইত।* যাই হউক, এখন আমাদের কর্ত্তব্য, যাহাতে গোচারণ ভূমি রক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহার উপায় বিধান করা। যে সব জমীদার রাজবিধান না মানিয়াও গোচারণভূমি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের নিকট অনুনয় বিনয়ে তাঁহাদের ভ্রম প্রদর্শন করা— শেষে যদি তিনি নিতান্তই নীচকুলোদ্ভব অর্থপিশাচ হন, তাহা হইলে উপযুক্ত প্রতিবিধান করা। রাজার উচিত, যেমন

---

* হিন্দুদিগের যে শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করণের প্রথা আছে তাহা সামাজিক হিসাবেও বড়ই প্রয়োজনীয়। ধর্ম্ম সমাজ ছাড়িয়া নয়। অবশ্যই তদ্দ্বারা ক্ষেত্রস্বামীদের বা সাধারণের কথঞ্চিৎ ক্ষতি হইতে পারে কিন্তু লাভের তুলনা করিয়া দেখিলে ইহা যে কতদূর উৎকৃষ্ট ও সুপ্রথা তাহা সহজেই অনুমেয়। এস্থলে বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক যেভাবে তাহাদের ব্যবস্থা হইতেছে তাহা বাস্তবিকই হিন্দু সমাজের মর্ম্মান্তিক এবং সমগ্র ভারতের [illegible] অনিষ্ট কারক।

আইন প্রণয়ন করিয়া গোচারণ ভূমি রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন তেমনি সে নিয়ম যথাযথ রূপে প্রতিপালিত হইতেছে কি না, পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাহার অনুসন্ধান লওয়া; আরও—যে সব গোচারণ ভূমি, আবাদী জমীতে পরিণত হওয়াতে, বাস্তবিকই জনসাধারণের ক্ষতিকর হইয়াছে, সে গুলি উপযুক্ত ভাবে অনুসন্ধান করিয়া পুনরুদ্ধার করা। দেশবাসীরও 'গো' রক্ষা, প্রতিপালন, ইত্যাদির প্রতি বিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত। * সমাজের উচিত যে জমীদার গোচারণ ভূমি বন্দোবস্ত করিবেন আর যে ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিবে, তাঁহাদের উভয়কেই সামাজিক শাসনে দণ্ডিত করা। এইরূপ হইলে কিয়দংশে সুফল হইবার আশা করা যায় না কি?

মামলা মকর্দ্দমা—আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। বৎসরে ভারতে অনেক টাকার ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হয়। আমরা যদি ন্যায়পথে বিচরণ করি তাহা হইলে অধিকাংশ সময়েই মামলা মকর্দ্দমা করিবার প্রয়োজন হয় না। যদি নিতান্তই

* কসাইদারকে গরু বিক্রয় করা কাহারও উচিত নয়। যাহারা সমস্ত জীবন দুর্ব্বিষহ পরিশ্রম করিয়া আমাদের হিত সাধন করিয়াছে, অসময়ে এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে হত হইবার জন্য কসাইদারের হাতে তাহাদিগকে প্রদান করা কি হৃদয়বান মনুষ্যোচিত কর্ম্ম? সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িলে সাবোয়ারী প্রতিষ্ঠিত, 'পিঁজরাপোলের গোশালায়' পাঠাইয়া দেওয়াই সদ্যুক্তি। আর প্রতি গ্রামে যাহাতে এইরূপ গোশালা প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়, তন্নিমিত্ত সকলেরই কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রয়োজন হয় "সালিসীর" দ্বারায় অনায়াসে নিষ্পত্তি হইতে পারে। মামলা মকর্দ্দমায় লাভ ত হয়ই না, অধিকন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়ই হয়। আরও সংসারে বিবাদ বিসংবাদ যত না হয় ততই ত মঙ্গল।*

বিলাসিতা অন্য দেশের লোকের তুলনায়,আমাদের কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে যে টুকুও হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ অন্যায়। উদাহরণ স্বরূপ সিগারেটের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সিগারেট না খাইলে কি আমাদের চলে না? আমেরিকা শীত প্রধান দেশ হইয়াও 'চা' খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, আর আমাদের সখের খাতিরে ঘড়ি ঘড়ি সিগারেট না টানিলেই কি নয়? এক আনার তামাক কিনিলে পাঁচ জন লোকের সমস্ত দিন যায়, অথচ এক আনার সিগারেটে পাঁচ জনের দু' বারের বেশী খাওয়া হয় না। অপিচ পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রাদির পীড়া জন্মাইয়া এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের ভঙ্গুরত্ব আরও বাড়াইয়া তুলি-—

* চরিত্রবান্ অথচ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের মধ্যস্থতাকেই সালিসী বলে। স্বগ্রামে তেমন লোক না থাকেন (লোক অবশ্যই আছেন তবে নানা কারণে হয়ত তোমার তাঁহার উপর বিশ্বাস নাই) উভয় পক্ষেরই মতানুযায়ী পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সালিসী মান্য করিয়া লইলেই হয়। ইচ্ছা থাকিলে কর্ম্মে ব্যাঘাত হয় না, উপায় হয়ই হয়। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের ন্যায় লোক নাই বা পাইলে, যাঁহারা কিয়ৎপরিমাণেও ভাল তাঁহাদের দ্বারাতেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। আইনও সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন বিবেকী ব্যক্তিদের মতামত বই আর কিছুই নয়।

বার ক্ষমতা সিগারেটের খুবই বেশী, তথাপিও সিগারেট টানিয়া বাবু সাজিবার সাধ!!! একেই বলে বিলাসিতা। কি স্বদেশী, কি বিদেশী, সিগারেট ব্যবহার করাই অন্যায়। (বিড়ীর কথাও সমভাবে প্রযোজ্য)।

এ সময় ধনি-সন্তানদের উচিত, বিলাস কমাইয়া লোক-হিতকর কার্য্যে মন-সংযোগ করা। তবে তাঁহাদের অবস্থানু-যায়ী যতটুকু আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের অবশ্য রাখিতেই হইবে; আর রাখাও উচিত, তাহাতে অনেক শিল্প রক্ষা হয়; তবে তাই বলিয়া যেন (এখন যেমন হইতেছে) বাড়াবাড়ী না হয়। সম্ভবাতিরিক্ত সকল কর্ম্মই দূষণীয়। ধনীদের পক্ষে যাহাই হউক, অন্যান্য জন সাধারণের পক্ষে বিলাস বিষবৎ পরিত্যাজ্য। মোট কথা অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা হইলে সকল গোলই মিটিয়া যায়।

আহার্য্য দ্রব্যের রপ্তানি—এখন, অন্য কোন অনিষ্ট অপেক্ষা, ইহাই আমাদের সর্ব্বপেক্ষা অনিষ্টকারক হইয়া উঠিয়াছে। যেরূপ ভাবে রপ্তানি হইতেছে, তাহাতে আমাদের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে; আবার একেবারে বন্ধ হইলেও আমাদের বিশেষ কোন লাভ হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে উচিত জাপান গভর্ণমেণ্টের ন্যায়, আমাদের গভর্ণমেণ্টেরও আইন করিয়া অত্যধিক রপ্তানি বন্ধ করা। তিন বৎসরের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্যাদি না রাখিয়া রপ্তানি করিলে, এক বৎসরের ঈতিতে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী উপস্থিত হইবেই হইবে। রাজা প্রজার

মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়ী। রাজার প্রজা পালন করাই সর্ব্ব-প্রধান কার্য্য। ইহাতে প্রজার মনে রাজার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে, আর রাজত্বের স্থায়িত্বেরও দৃঢ়তা সম্পাদন হয়। অত্যধিক রপ্তানি বন্ধ করা রাজার সম্পূর্ণ উচিত। আর যথাসম্ভব ধান্যাদি মজুদ রাখা আমাদের নিজের পক্ষে কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐই শেষোক্তটি কতদূর সম্ভবপর বলিতে পারি না।

আর একটি উপায় আছে, তদ্দ্বারা রপ্তানি বন্ধ না হইলেও অনেকাংশে উপকার হইবার সম্ভাবনা। দেশের জমীদার মহাশয়েরা যদি তাঁহাদের এলাকাধীন প্রত্যেক গ্রামে এক একটি "ধর্ম্মগোলা" স্থাপন করেন, তাহা হইলেও অনেকাংশে এ অভাব দূর হইতে পারে। একটি গোলার অধীনে যতগুলি গ্রাম থাকিবে, সেই সমস্ত গ্রামের তিন বৎসরের খোরাকী উপযুক্ত ধান্য সদা সর্ব্বদা মজুত থাকিবে। জমীদার মহাশয়েরা গ্রামের মধ্যেই চাঁদা তুলিয়া (ধান্যের) এবং নিজেরাও স্বীয় তহবিল হইতে (বিনা সুদে আপাততঃ দানস্বরূপ) টাকা দিয়া যথাসম্ভব ধান্য মজুত করিলেন। প্রতিবৎসরই "বাড়ি" দেওয়াতে আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, পরে যখন তিন বৎসরের উপযুক্ত ধান্য মজুত হইয়াও বৃদ্ধি হইল, সেই সময় উদ্বৃত্ত ধান্য বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। ঐ টাকায় জমীদার মহাশয়ের টাকা শোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, জলপ্লাবন ইত্যাদির জন্য বাঁধ ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া দেশের কৃষিকার্য্যের সাহায্য করিতে লাগিল।

দেশবাসীরও কষ্টের লাঘব হইয়া ভবিষ্যত কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইল।* বিনীত প্রার্থনা, জমীদার মহাশয়েরা এবং সমাজ এই জনহিতকর ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে সংকল্প করুন। দেশের এ অবস্থা দেখিয়া, চক্ষের সম্মুখে সহস্র সহস্র কঙ্কালাবশিষ্ট জনগণের হাহাকার ধ্বনি শুনিয়াও কি আপনাদের প্রাণে দয়ার উন্মেষ হইবে না? দুই চারি বৎসরের চেষ্টায় না হউক, দশ পনের বৎসরের চেষ্টায় ইহা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব নয়। আমি না পাইলেও আমার সন্তান সন্ততিবা ইহার দ্বারা বিশিষ্টরূপ উপকার পাইবেই পাইবে।†

আমরা যেরূপ দরিদ্র তাহাতে আমাদের বৃথা ব্যয় করা কোন মতেই উচিত নয়। আমাদের নিতান্ত উচিত ব্যয় সংক্ষেপ করা। পুত্রকন্যার বিবাহাদিতে আমাদের অনেক

---

* বলা বাহুল্য, যেন বাড়ির হার অতিরিক্ত না হয়। এক রাত্রিতেই রাজা হইব ইচ্ছা করিলে কিছুই সুসম্পন্ন হয় না। লোকের কষ্টের লাঘবের জন্যই যে ইহার প্রতিষ্ঠা এটি যেন সর্ব্বদাই মনে থাকে। (যে কোন কারণেই হউক জমিদার যদি সাহায্য করিতে নাই-ই পারেন) গ্রামবাসিগণ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদেরই সাধ্যমত সমবেত চেষ্টায় যে সফল হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও প্রতি গ্রামে গ্রাম্যফণ্ড স্থাপিত হউক, বিপদে সম্পদে সকল সময়েই তাহার তাবৎ কার্য্যই গ্রাম্য কমিটি হইতে সম্পন্ন হইতে থাকুক, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

† ধর্ম্ম গোলা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার থাকিল। যদি কখনও সুবিধা পাই বিশেষ করিয়া বলিব। এস্থলে নিবেদন স্বীয় বাঁসগ্রামে ধর্ম্মগোলা স্থাপন উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকের লব্ধাংশ ব্যয়িত হইবে। পরিশিষ্ট দেখুন।

টাকা বৃথা ব্যয় করিতে হয়। এরূপ হওয়া কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। এ সময়ে একটি পয়সারও অপব্যয় না করিয়া যাহাতে ধর্ম্মগোলা প্রতিষ্ঠাদি সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কৌলীন্যের বিধান ভাল হইয়াও আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। আজ কাল যেরূপ বরের পণ, ঘড়ি চেন ইত্যাদিতে কন্যাকর্ত্তাকে ভিটা মাটী বিক্রয় করিতে হয়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। ইহাতে সমাজেরও বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে, হয়ত একজনের পাঁচটি কন্যা হইল, সে টাকা দিয়া বিবাহ দিতে সমর্থ হইল না—অগত্যা শুক্রবিক্রয়রূপ মহাপাপে নিমগ্ন হইতে চলিল। এ ক্ষেত্রে দোষ কার? সমাজের নয় কি?

"কুলীনের আর সে গুণপণা দেখিবার আবশ্যক নাই। বংশানুগত হইলেই কুলীন হইল।"—একপ অবস্থায় আর কুলীন কুলীন বলিয়া চীৎকার করা কেন? যে যেমন পার সে তেমনি কর, তোমার কন্যা পছন্দ হয় বিবাহ দাও, নচেৎ শুদ্ধ টাকা টাকা করিয়া সমাজের মাথা খাও কেন? সমাজের কি কোন ক্ষমতা নাই যে এই কুপ্রথার পরিবর্ত্তন করে?—অবশ্যই আছে। 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বের' সময় আর এখনকার সময়ে কত প্রভেদ। বোধ হয় এইবার সময় উপস্থিত, এখন একবার সকলে মিলিয়া বিশেষরূপ চেষ্টা করিলে এ প্রথার মূলচ্ছেদ হয়। "যে পক্ষে অর্থাদি আদান প্রদান হইবে সে বিবাহে কোন ব্যক্তিই আহার করিবেন না, পৌরোহিত্য

করিবেন না বা কোনরূপ সাহায্যই করিবেন না।—" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে ইহা অতি অল্প সময়ে নিশ্চয়ই সমাজ হইতে দ্রবীভূত হইয়া যায়। সমাজ চেষ্টা করিবেন কি ?—করা সর্ব্বতোভাবে উচিত ; সময়ও অনুকূল।

চাকরী করিয়া কয়টি লোকে সুখসচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে ? অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ব্যবসা এবং কৃষির প্রতি মনোযোগ করা একান্ত কর্ত্তব্য—নচেৎ গত্যন্তর নাই। দেশের লোক পরিশ্রমের উপযুক্ত মজুরী পাইলে, দেশের কষ্ট ঘুচিবেই ঘুচিবে। মনে কর, বিদেশীকে ধান্যাদি বিক্রয় করিয়া চাষীদের দুইলক্ষ টাকা লাভ হইল, কিন্তু কাপড়, দেশলাই, চিনি, জুতা, ছাতা, এসেন্স, ঔষধ ইত্যাদির জন্য বিদেশবাসীকে উভয়বিধ লোকেই পাঁচলক্ষ টাকা দিল। এক্ষেত্রে লাভ হইল কি ? তিন লক্ষ টাকা লোকসান হইল আরও কামার, কুমর, তাঁতী, মুচি, বেনে, ইত্যাদিরা অন্নাভাবে হাহাকার করিতে লাগিল। তাই আমরা যদি সকলেই দেশজাত জিনিষ পত্র ব্যবহার করি, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই অন্ন সংস্থান হয়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুযুক্তি আর সেই যুক্তির কার্য্য 'স্বদেশী আন্দোলন'। লোকে একটি গুণ অবলম্বন করিলে আনুষঙ্গিক অনেক গুণই তাহাতে স্বতঃই উপস্থিত হয়। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মহারাজ বিক্রমাদিত্য একমাত্র সাহসকে অবলম্বন করাতেই পুনরায় লক্ষ্মী পর্য্যন্ত আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আপাততঃ

যে কয়টি গুণ অবলম্বন করিতে চেষ্টা হইতেছে, এই কয়টিতেই দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ থাকিতে পারিলেই ক্রমে অন্যান্য সকল গুণই আসিয়া উপস্থিত হইবেই হইবে।

এস্থলে একটি কথা বলা বড়ই আবশ্যক মনে করিতেছি, স্বদেশী আন্দোলনে প্রায়ই দেখিতে পাই, হিন্দু এবং মুসলমান-দের লইয়া কথা। এটি কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। ভারতে প্রায় বিশ লক্ষ খৃষ্টানের বাস। পার্শী, বৌদ্ধ, শিখ ইত্যাদির কথা নাই ধরিলাম,—ইহাঁদিগকে না হয় হিন্দুর ভিতর ধরিলাম; কিন্তু খৃষ্টানদিগকে ত হিন্দু মুসলমান কাহারও অন্তর্নিবিষ্ট করা চলে না। ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করা ত কোন মতেই উচিত নয়। আজ ভারত কি কেবল হিন্দু মুসল-মানের জননী স্বরূপা? খৃষ্টিয়ানদের নয় কি?—দেশ যেমন হিন্দু মুসলমানের ভক্তির সামগ্রী; ভারতীয় খৃষ্টানদিগেরও তদ্রূপ। আরও যদি আমরা কোন কালে ঔপনিবেশিক স্বাধী-নতা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে কি কেবল হিন্দু, মুসল-মানই পাইব?—না তাহা কখনও হইতে পারে না। আবার ঔপনিবেশিক সাধারণতন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন বিধান এদেশে হওয়াও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না কি? কাজেই এক্ষেত্রে ভারতবাসী মাত্রেরই আবশ্যকতা আছে।* দেশের মন্ত্র—

* এমন কি ইউরোপীয়েরাও যাঁহারা এ দেশে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন, তাঁহারাও ভারতীয়। তাঁহাদিগকেও ত্যাগ করা উচিত নয়। শুধু হিন্দু মুসলমানাদি কেন, ভারতের হিতে ইহাঁদেরও হিত এবং ভারতের অনিষ্টে ইহাঁদেরও অনিষ্ট অনিবার্য্য নয় কি?

"বন্দে মাতরম্"। ইহা হিন্দুরও একক নয়, মুসলমানের ও একক নয়, ইহা সকলেরই। ইহা জাতিগত, বা সম্প্রদায় গত মন্ত্র নয়;—ইহা সকলেরই। হিন্দুদিগের ধর্ম্মগত মন্ত্র "জয় নারায়ণ"; মুসলমানদিগের "আল্লাহো আকবর" খৃষ্টিয়ানদের "জয় খৃষ্টের জয়" শিখদের "জয় গুরু নানকের জয়" ইত্যাদি, কিন্তু দেশ গত কার্য্যে এরূপ পার্থক্য হওয়া ত উচিত নয়। দেশ সকলেরই; দেশবাসী সকলেরই দেশগত কার্য্যে একমন্ত্র "বন্দে-মাতরম্"। ইহার ভিন্ন আচরণে কখনও সুফল হইবে না;—হইতে পারেও না। বিদেশী কাপড়, চিনি, ইত্যাদি আমাদের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ এবং দেশের অনিষ্টকারক বলিয়া আমরা যেমন ত্যাগ করিতেছি, খৃষ্টিয়ানগণ তেমনি দেশের অনিষ্টকারক ভাবিয়াই ত্যাগ করুন। খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে অনেক মাননীয় প্রতিভা-শালী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা সত্বর অগ্রসর হউন। দেশের হিতে সকলেরই হিত এবং দেশের অনিষ্টে সকলেরই (দেশ বাসী মাত্রেরই) অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী এটি যেন সকলেরই সর্ব্বদা মনে থাকে।

স্বদেশী আন্দোলন সফল করিতে হইলে এখনও বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। আমাদের অবস্থা অতীব অসচ্ছল, কাজেই যেখানে দু' পয়সা সস্তা, সেইখানেই বিক্রয় বেশী। লোকের ইচ্ছা স্বত্বেও দেশী বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিতেছে না;—স্বদেশী আন্দোলন প্রকৃত সফলতা লাভ করিবে যখন প্রতিদ্বন্দিতা-ক্ষেত্রে অন্ততঃ সমান মূল্যে দিতে পারা যাইবে। তাহার পূর্ব্বে

বিশেষ ফলের সম্ভাবনা কম। আর সেই জন্যই যাঁহাদের অবস্থা ভাল, তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য, স্বদেশী ভিন্ন বিদেশী দ্রব্য একবারেই ক্রয় না করা। সমাজবন্ধনের মধ্যে ফেলিয়া লোককে বাধ্য করাও মন্দ নয়; কিন্তু সে বিষয়ে চিনি ইত্যাদি বিষয়ই বেশী সফলতা লাভ করিবে। পেটে না খেলে চলে,—গোল্লা না খেয়ে গুড় খেলে ত কোনই ক্ষতি হয় না, বরং দু' পয়সা শস্তায় হয়; কিন্তু প্রতি কাপড় খানায় এক আনা দেড় আনা অধিক মূল্য দেওয়া শুধু গরীব দুঃখীদের পক্ষে কেন, অনেকের পক্ষেই ক্লেশকর। অবশ্যই প্রাণে ভক্তি থাকিলে, দেশের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এ ক্ষতি টুকু সহ্য করা বেশী কথা নয়।* কিন্তু, যাহারা একে অশিক্ষিত, তাহাতে আবার দিনান্তে উদর পূর্ণ করিয়া আহার পায় না; এই দুর্দ্দান্ত শীতে গাত্রবস্ত্রহীন, তাহাদের নিকট হইতে এ স্বার্থত্যাগ টুকু ভরসা করাই যে আশাতিরিক্ত।

সেই জন্যই বলি, যাঁহাদের অবস্থা ভাল তাঁহারা, এবং যাঁহারা দেশের মঙ্গলামঙ্গল একটুকুও ভাবিতে পারেন দরিদ্র হইলেও তাঁহারা যেন একেবারেই বিদেশী দ্রব্যাদি ক্রয় না করেন। অন্য লোকেও প্রতিদিন মুষ্টি ভিক্ষা হিসাবে চাউল রাখিয়া—পরিশেষে আটখানি বস্ত্রের মধ্যে অন্তত, পাঁচ খানি

* বড়ই সুখের বিষয়, ক্রমেই স্বদেশী কাপড় সস্তা হইতেছে।—এখন আর কাহারও কোন আপত্তি করা উচিত নয়। তবে আরও সস্তা আরও মার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু মিলের কাপড়ে বিশেষ ফল হইবে কি?

দেশী ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। এ প্রথাটিও সাধারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত। ধনী ব্যক্তিদের উচিত এই সময় ছোট ছোট কলকারখানার প্রতিষ্ঠা করা।* গত

---

* এখানে একটি কথা বলিব।—তাঁতের কাপড় আমাদের যেরূপ বাঞ্ছনীয় মিলের কাপড় তদ্রূপ নয়। মিলের বিস্তৃতি সীমাবদ্ধ; ইহাতে (সমগ্র দেশের লোক সংখ্যায়) কয়জনের হিতসাধন হইতে পারে। তাঁত, অসীম—অনেকেই (অন্ততঃ পরিবারিক হিসাবে অবসর সময়েও) তাঁত-বয়ন করিতে পারেন, ইহাতে স্বতঃপরতঃ সংসারের হিত সম্ভাবনা। আরও বেশী পরিমাণে 'মিল' (কল) হইলে দেশের মঙ্গল হয় না। মানুষ মাত্রেই শান্তির পক্ষপাতী; কিন্তু উদরান্নের জন্য যদি স্ত্রীপুত্র পরিজন, স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দূর দূরান্তরে দুর্বিষহ পরিশ্রমে নিযুক্ত হইতে হয়, তাহা হইলে (ব্যক্তিগত ভাবে) তাহারও শান্তি নাই আর (সমষ্টি হিসাবে) গ্রামেরই বা মঙ্গলের আশা কোথায়?—আধুনিক পাশ্চাত্য প্রদেশে ইহা একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

বড় বড় ধনিগণ আড়ত স্থাপন করুন; সেখানে যে যেমন কাপড় আনিবে সে তেমনই মূল্য পাইবে। কোন জিনিষই অবিক্রীত থাকিবে না। উপযুক্ত মূল্যে সবই বিক্রয় হইবে। আর যাহাতে দেশে সূতা উৎপন্ন করিয়া তুলনায় খুবশস্তা বিক্রয় করিতে পারা যায়, তাহার জন্য চেষ্টা হউক এবং এই উদ্দেশ্যে বরং গুটিকতক মিলের স্থায়িত্ব বাঞ্ছনীয়। নচেৎ গুটিকতক ধনী ব্যক্তির দ্বারা গঠিত কতকগুলি মিল স্থাপিত হইলে দেশের জনসাধারণ যে কোনই বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবে না এবং যে উদ্দেশ্যে আন্দোলন তাহা যে সম্পূর্ণ বিফল হইবে, ইহা একরূপ ধ্রুবনিশ্চয়।—ইহাতে কেহ কেহ আমাদের স্বদেশী দ্রব্যাদি গ্রহণের বিপক্ষপাতী ভাবিতে পারেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়; এখন যাহা হইতেছে, ইহা মন্দের ভাল, এইমাত্র। আমরা ইহাতে সন্তুষ্ট বটি কিন্তু আশান্বিত নই। যে ইংরাজ জাতির পদতলে সসাগরা ধরার বাণিজ্য নতশির, যে লণ্ডন নগরে সমগ্র জগতের বাণিজ্য কেন্দ্রীভূত, সেই লণ্ডন নগরেরই বক্ষের উপর সহস্র সহস্র নরনারী উদরান্নের জন্য হাহাকার করিতেছে? এ সব দেখিয়াও কি আমাদের অন্ধের ন্যায় অনুবর্তন করিতে হইবে? বস্তুতঃই এখন শ্রমজীবী

পূর্ব্ব বৎসর 'ওয়েল্‌স্‌' প্রদেশে মুষিকের দৌরাত্ম্যে শস্য নষ্ট হইতেছিল, আমাদের সাম্রাজ্ঞী মূষিকের চামড়ার দাস্তানা পরিধান করিলেন। লর্ড পত্নীরা অনুকরণ করিলেন, ক্রমে দেশময় মূষিকের চামড়ার দস্তানা প্রচলিত হইয়া মুষিক কুলের ধ্বংস সাধন করিল। দেশের শ্রমজীবীরাও দুই পয়সা লাভ করিল।* এসব দেখিয়া শুনিয়াও কি আপনাদিগের চৈতন্য হইবে না? ছোট, ছোট, কল কারখানাদির প্রতিষ্ঠা করুন, তাহাতে লাভের যোলআনা সম্ভাবনা, আরও দেশের জন সাধারণ তাহাতে বিশেষ উপকার পাইবেই পাইবে। বাস্তবিকই প্রকৃত ইচ্ছা হইলে কার্য্য অসম্পন্ন থাকে না। কোনও সময়ে একজন ধনী বৈশ্য তাঁহার দরিদ্র

সমস্যা বড়ই গুরুতর বলিয়া প্রসিদ্ধ রাজনীতিকেরাও স্বীকার করিতেছেন। যে দিন হইতে মিলের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সেইদিন হইতেই সাধারণের কষ্টের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। আমরাও কি তাহাই চাই?—তবে কি 'মিল' না হওয়াই আমাদের মত? না তাহাও নয়—আমরা চাই দেশে সূতা প্রস্তুতার্থ, লৌহ যন্ত্রাদির প্রস্তুতার্থ, কাচ নির্ম্মাণার্থ, যতগুলি কল আবশ্যক, যাহা হইলে অভাব দূর হইতে পারে, তাহাই;—তদরিক্ত একটিও চাই না। একথা এখানে বলিতে হইতেছে কেন ইহারও একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। অধিকাংশ সকলেরই লক্ষ্য—মিল। তাঁতই যে লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক, যতদিন না লক্ষ্য সিদ্ধ হয় ততদিনই যে মিলের আবশ্যক—তাঁতই মূল লক্ষ্য—অন্নই প্রধান খাদ্য, ব্যঞ্জন শুধু আনুষঙ্গিক মাত্র—একথা প্রায় কেহই বলেন না। তাই স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য ইহার পুনরাবতরণা মাত্র।

* সমাজের উচ্চস্থানীয় সম্মানভাজন ব্যক্তিগণ যেরূপ করেন, নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণ মধ্যে তাহার প্রচলন হওয়াই স্বাভাবিক। এ অনুকরণ বৃত্তি যত্নপূর্ব্বক শিখাইতে হয় না।—আপনিই আসে।

স্বজাতীয়দিগকে মূলধন দিতেন। একজন দরিদ্র বৈশ্য-বালক, কোন সময়ে, তাঁহার নিকট মূলধন আনিতে গমন করে। তখন তিনি আর একটী লোককে ভৎসনা করিতে ছিলেন। লোকটী উপর্য্যুপরি তিন বার মূলধন নষ্ট করিয়া, পুনরায় তাঁহার নিকট অর্থ গ্রহণার্থে উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেছিলেন "বাপু, ব্যবসা বুদ্ধি থাকিলে ঐ মৃত ইন্দুরটী হইতে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করা যায়; ব্যবসার মূলমন্ত্র,—সাধুতা আর অধ্যবসায়; ইহা যাহার নাই, তাহার পক্ষে ব্যবসা না করাই সুসঙ্গত।" বলা বাহুল্য সম্মুখেই একটী ইন্দুর পড়িয়াছিল। বালক এই কথা শুনিয়া সেই মৃত ইন্দুরটীকেই মূলধন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ ইন্দুরটী একটি বিড়ালের জন্য ক্রীত হওয়ায় সে এক পয়সা মূল্য পাইল। পর দিবস ঐ এক পয়সার ছোলা কিনিয়া, এক কলসী জল লইয়া, দূরবনে কাঠুরিয়াদিগকে জলপান করাইয়া কিছু কাঠ আনিল। এইরূপে মাস কয়েক মধ্যে তাহার বিস্তর কাঠ মজুত হইলে, বর্ষাকালে বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় এক খানি ছোট দোকান খুলিয়া বসিল। কাহাকেও ঠকাইত না, ওজনে কোন রূপ জুয়াচুরি হইত না। দর দাম এক কথায় নিষ্পত্তি হইত, কাজেই দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া শেষে বেশ ধনবান হইয়া, সুখ সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। মোট কথা, সাধুতা আর অধ্যবসায় থাকিলে

অর্থ উপার্জ্জন খুব শক্ত কাজ নয়। পরিমীতব্যয়ি হও, ব্যবসায় সুফল লাভ করিবে। ব্যবসা ভিন্ন আর্থিক অবস্থা কখনও আশাপ্রদ হইতে পারে না—হইবেও না।

মন উন্নত কর। স্বার্থ ত্যাগ কর, শিক্ষা বীজ—ফল স্বার্থত্যাগ। জাপানবাসিগণ নিজ নিজ স্বার্থ বলিদান দেওয়াতেই আজ জাপান সমুন্নত। স্বার্থ দুই প্রকার, সঙ্কুচিত ও প্রসারিত। আমার পরিবারদের জন্য যে স্বার্থরক্ষা তাই সঙ্কুচিত;—আর গ্রামের বা দেশের জন্য যে স্বার্থ সংরক্ষণ তাই প্রসারিত। সঙ্কুচিত স্বার্থের বিসর্জ্জন না দিলে প্রসারিত স্বার্থ রক্ষা হয় না। ক্ষুদ্র স্বার্থের অন্তর্গত অতীব ভয়ানক আরও এক প্রকার স্বার্থ আছে,—বৃত্তিস্বার্থ। ইহাই সর্ব্বপেক্ষা নীচ কিন্তু কার্য্যতঃ—সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কর্ম্মকে ভাল বাসিয়া কর্ম্ম না করিলে লক্ষ্য স্থির থাকিতে পারে না, সামান্য কারণেই বিচ্যুতি ঘটে। যশঃ, লোভ ক্রোধ ইত্যাদির প্রতিশোধ বা লাভেচ্ছা জনিত যে কার্য্য তাহা কখনও সম্পূর্ণ রূপে বিশুদ্ধ হইতে পারে না। ভগবান বলিয়াছেন, কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য কর, ইহার অর্থ কি? স্বীয় কর্ম্মই যদি তোমার মুখ্য লক্ষ্য না হইয়া যশঃ প্রভৃতিতে বিচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলে সে কর্ম্ম কখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুসম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব অন্য কাহারও ক্রোধাদি এবং তোমার যশ মান ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, এক কথায় সম্পূর্ণ রূপে ভগবৎ প্রীতিসাধনার্থ কর্ম্ম করিতেছ;

ভাবিয়া কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইতে পারিবে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে এইরূপ কর্ম্মই ছিল। ধাত্রী পান্না বনবীরের হস্ত হইতে রাজশিশুকে রক্ষা করিবার জন্য স্বকীয় পুত্রের নৃশংস হত্যাসাধনার্থ প্রস্তুত হইয়া, জগতে যে মহনীয় কার্য্য করিয়াছে তাহার তুলনা আছে কি ?—এক রাজপুত্রের প্রাণরক্ষারূপ কর্ম্মেই সে তখন আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। সে একমাত্র কর্ত্তব্য ভিন্ন, সামান্য অপদার্থ যশপ্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা করিয়া এরূপ কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় কি ?—না তাহা ত নয়, সে যে তখন ক্ষুদ্র আমিত্বের ওপারে। এইরূপে ক্ষুদ্র স্বার্থের দূর করিতে পারিলেই যাবতীয় মহৎ কার্য্য করিবার সামর্থ্য জন্মে। তাহার পূর্ব্বে যত দিন,—'আমার সঙ্গে উহার দলাদলি', 'সে ধর্ম্মগোলা স্থাপন করিয়াছে, তাহাতে উহার নাম হইবে, আমি উহাতে যাইব না বরং যাহাতে নষ্ট হয় তাহার উপায় করিব'—'আমি এত বড় লোক, আমার কথার উপর কথা, আমার বিনানুমতিতে কাজ, দেখিব কেমন করিয়া কৃতকার্য্য হয়, কেমন করিয়া গ্রামে বাস করে', ইত্যাদি রূপ বৃথা অভিমান, 'হামসে দিগর নাস্তি' ভাব বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন কি আমাদের শুভ হইবার সম্ভাবনা আছে ? যিনি নিজে আজীবন কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া পিতৃস্বার্থে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেই ভীষ্মের ন্যায় মহাপুরুষের উচ্চ আদর্শ—তদপেক্ষাও উচ্চ

আদর্শ শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যাবলী,—দধীচি মুনির অস্থি প্রদানাদি বৃত্তান্ত চক্ষের সম্মুখে জলন্ত আদর্শ রূপে প্রতিভাত থাকিলেও আমরা তাহাতে দৃঢ়ব্রত হইতে পারি না। ক্রমেই আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে চলিয়াছি, অথচ এখনও দৃকপাত করিবার অবসর হইতেছে না। আমরা এতই স্বার্থপর যে স্বীয় স্ত্রী এবং পুত্র কন্যা ভিন্ন অন্য কোনও লোকের প্রতি, এমন কি এক মাতৃগর্ভোৎপন্ন সহোদরের প্রতিও যে একটী কর্ত্তব্য আছে তাহাও পালন করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত।—বঙ্গোপসাগরের জলে দেশ বিধৌত না হইলে আর আমাদের মঙ্গলের আশা নাই। আঁধার ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পাই না।—আঁধার—আঁধার!! যদি কেহ চক্ষুষ্মান থাক, এস আমাদের দেখাইয়া দাও। ভগবান! মহাপ্রলয়ের আর বিলম্ব কত?—যাই হউক, যদি ভাল চাও, ভবিষ্যতে বিস্তৃত মঙ্গলের আশা কর, এইরূপ ক্ষুদ্রবিধ স্বার্থ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা কর, নচেৎ সমস্তই বৃথা।—সর্ব্বদা মনে রাখ ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন না দিলে প্রসারিত স্বার্থ রক্ষা হয় না।

ইতিহাস অধ্যয়ন কর। ইতিহাস অধ্যয়ন শুধু গোটাকতক যুদ্ধের নামাদি মুখস্থ করিবার জন্য নয়। ইতিহাস দেশের জীবন। ইতিহাস দেশের জ্যোতিষ। গত বিষয়ের সহিত বর্ত্তমানের সমালোচনায় ভবিষ্যৎ পরিণাম জানিবার একমাত্র উপায়ই ইতিহাস। কোন কোন জাতি কি কি গুণাবলম্বনে জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল, আবার কি কারণেই বা পুন

অধঃপতনে গিয়াছে, তাহা জানিবার একমাত্র উপায়ই ইতিহাস। ইতিহাস যেমন দেশের জীবন, তেমনি দেশীয় সাহিত্যও। * মাতৃভাষা এবং দেশগত সাধারণ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। † কতকগুলি শব্দের সহযোগে যে ভাব বিনিময় করা যায়, তাহার মূল্য বড় কম নয়। জগদ্বিখ্যাত মহাপুরুষ, বীরকুলচূড়ামণি নেপোলিয়ন তাঁহার সৈন্যগণকে কি প্রকারে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার জন্য উদ্দীপিত করিতেন, ইতিহাস অভিজ্ঞ পাঠকের তাহা

---

* এস্থলে আরও একটী কথা বলিবার আছে ঃ—যিনি যে জাতির কবি, তিনি সেই জাতিরই জাতীয় জীবন প্রস্তুত করেন। আমরা ধার্ম্মিক বলিতে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরাদিকেই বুঝিয়া ফেলি ; বীর বলিতে—ভীমার্জ্জুনের তুল্যই বোধ হয় (নেপোলিয়ন, জর্জ্জ ওয়াশিংটন হয় না) ; কবি বলিলেই —ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসেরই মূর্ত্তি মনোমধ্যে আসিয়া স্বতঃই উপস্থিত হয় ; ওয়ার্ডসওয়ার্থ সেক্সপীয়র, দান্তে শেলী আসে না। এ প্রকৃতি গঠন কার কার্য্য ?—কবির নয় কি ? তাই কবি, জাতির জীবন প্রস্তুত কারক। রামায়ণ মহাভারতের উপর চরিত্র গঠিত নয় এমন লোক (হিন্দুদের মধ্যে) আছে কিনা জানি না। কবির কার্য্য—আদর্শ স্থাপন করা। আর এই আদর্শ যিনি যত উচ্চে স্থাপিত করিতে সমর্থ তিনিই তত উচ্চ কবি। শব্দ সংযোজনার শক্তি না থাকিলে কেহই 'কবি' (আদর্শ নির্ম্মাতা) হইতে পারেন না। শব্দই হৃদয়তন্ত্রীকে আঘাত করিয়া ভাব আনয়ন করিতে সমর্থ। আর এই কারণেই রৌদ্ররস, বীররস, করুণরস, ইত্যাদিতে বিভিন্ন ছন্দ ও প্রকৃতি অনুসারে কঠোর কোমল শব্দ সংযোজনার ব্যবস্থা আছে। শব্দের সুউচ্চারণের শক্তি ও প্রয়োজন, ধর্ম্ম পরিচ্ছেদে কথঞ্চিৎ বিবৃত হইয়াছে।

† একমাত্র হিন্দী জানিলে ভারতবর্ষীয় সকলের সহিতই অবাধে ভাব বিনিময় করা যাইতে পারে।

অবিদিত নাই। তাঁহার সেই বাক্যাবলী শ্রবণ করিলে, এখনও শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। যাই হউক, সাহিত্যের উন্নতি হওয়া এবং প্রত্যেকেরই মাতৃভাষাদিতে জ্ঞান লাভ করা একান্ত উচিত। তবে যে সে যা' তা' বই পড়া এক কালেই উচিত নয়। যদি কাব্য পাঠ করিতে হয় ;—বৃত্রসংহার, মেঘনাদ বধ, বীরাঙ্গনা, ইত্যাদি ; যদি নবেল পড়িতে হয়,—দেবী চৌধুরাণী, কমলাকান্তের উইল, আনন্দমঠ, কমলাকান্তের দপ্তর, স্বর্ণলতা, রায় পরিবার, অনাথ বালক, শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী, ইত্যাদি ; জীবন চরিত পাঠ করিতে হয়,—রাজস্থান, আর্য্যকীর্ত্তি, দয়ার সাগর ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী, যোগেন্দ্রনাথের আত্মোৎকর্ষ ; যদি ইতিহাস পাঠ করিতে হয় ;—নিখিল বাবুর, সোনার বাংলা, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, অক্ষয়কুমার মৈত্রের সিরাজদ্দৌলা ইত্যাদি ; যদি নাটক পাঠ করিতে হয়,—নীলদর্পণ, জনা, বিবাহ-বিভ্রাট ইত্যাদি পাঠ কর, প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝ।* এবং অধীতআদর্শ পথে স্বকীয় জীবন পরিচালিত কর—কার্য্য কর; কার্য্যই মূল। শুধু মৌখিক বাক্‌চাতুরীতে কোন ফল নাই। কার্য্য কর, তবেই ক্রমে সুফল ফলিবে,—ভবিষ্যৎ আবার উজ্জ্বল হইবেই হইবে। মন উন্নত করিতে হইলে সৎসহবাস যেমন আবশ্যক, সাহিত্যাদির অনুশীলনও যে তদ্রূপ প্রয়োজনীয় একথা বিশেষ করিয়া বলাই বাহুল্য।

---

* কোন গরিষ্ট সম্পাদকের উচিত, অন্ততঃ সাহিত্য সভারও উচিত পাঠোপযোগী পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করা।

শেষ কথা সমাজ দৃঢ় কর। সমাজ এখন অনেক বিষয়ই দেখিয়াও দেখে না। যাহা সৎ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে তাহা অবশ্যই করিতে হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর। আমরা দশ জনে মিলায়াই ত সমাজ, প্রত্যেকেই যদি কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করি, সমাজের কুপ্রথা সকল রহিত হইতে কয় দিন লাগে বল। বর্ত্তমানে সমাজই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, সেই হেতু সকলেরই উচিত সমাজকে অগ্রণী করা। একটীর অভাবে আমাদের সকল কার্য্যই পণ্ড হইয়া যাইতেছে ; সেটী আর কি ?—পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। যত দিন এইটি না হইতেছে ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। আমরা পরস্পরের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে এবং যথার্থ কার্য্যতঃ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারি না কেন ?—প্রধানতঃ আমরা অধার্ম্মিক, স্বার্থপর, কপট, পল্লবগ্রাহী, অব্যবস্থিত চিত্ত, পরনিন্দুক, এবং আমাদের হৃদয়ের গভীরতা নাই। আজ যে কার্য্য করিবই করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, কল্য আর তাহা সামান্য স্বার্থানুরোধে করিলাম না। আমরা এতই স্বার্থপর ও অবিশ্বাসী হইয়াছি !! এমন স্থলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আস্থা, সহানুভূতি থাকে কৈ ? এই জন্য আমাদের দেশে যৌথ কারবার প্রায়শঃই বিফল হইয়াছে। বড় দুঃখেই কবিবর হেমচন্দ্র গাহিয়াছেন—

"হাঁসিতে কাঁদিতে প্রাণে, গভীরতা নাহি জানে
অসার নিঃস্রোত এই বঙ্গের হৃদয় !"

বাস্তবিকই অতি ঠিক কথা! হায়! হেমচন্দ্র তুমি কেন এ অধঃপতিত দেশে জন্মিয়াছিলে? আজ যদি জগতের অন্য কোন খণ্ডে তোমার আবির্ভাব হইত, তোমার গ্রন্থাবলী, তোমার স্মৃতি, স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া অশ্রুজলে সদা অভিষিক্ত হইত—জীবনের শেষকালে একমুষ্টি অন্নের জন্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইত না।

এখন আমাদের উচিত সঙ্কুচিত স্বার্থ-গণ্ডির বাহিরে থাকা, কপটতা বিসর্জ্জন দেওয়া, এবং প্রকৃত সৎ হওয়া।—আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও না, প্রতিজ্ঞা পালনব্রত পুনরায় আরম্ভ কর। যাহা মুখে বলিব, সৎকার্য্য হইলে তাহা করিবই করিব, এ প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে স্থাপন কর। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"—এমন্ত্র না ধরিলে আমাদের কোন বিষয়েই সুফল ফলিবে না, কোন জাতিরও কখনও ফলে নাই। কোন বিষয়েই উতলা হইও না। * যাহাতে ধর্ম্ম বজায় থাকে তাহার চেষ্টা কর;—সমাজ উন্নত কর, তাহা হইলে আনুষঙ্গিক

* অনেকেই বলিয়া থাকেন অন্য দেশজাত ঔষধ ব্যবহার করাও অন্যায় তবে ইহা ত্যাগ করা হইতেছে না কেন?—আমরাও বলি সত্যই অন্যায়। কিন্তু ব্যবহার্য্য দ্রব্য ভাগত্রয়ে বিভক্ত—অপরিহার্য্য, যাহা ত্যাগ করিলে প্রাণ হানির সম্ভাবনা।) কষ্টসাধ্য পরিত্যাজ্য (যাহা ত্যাগ করিলে আপাততঃ কষ্ট হইতে পারে); সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য (বিলাস দ্রব্যাদি) বিলাস দ্রব্যাদি ও কষ্টসাধ্য পরিত্যাজ্য দ্রব্যাদি প্রথমে, পরে ক্রমে ক্রমে অপরিহার্য্য বস্তুর অভাব পূরণ করিয়া পরিত্যাগ করাই যুক্তি। যাহাতে অপরিহার্য্য দ্রব্যের অভাব পূরণ হয় তাহারই চেষ্টা কর, নচেৎ অত উতলা হইলে চলিবে কেন?

সকলই উন্নত হইবে। "সমাজই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা!" ইহা মনে রাখিয়া, সর্ব্বদা বিধি সঙ্গত কার্য্য কর। অবশ্যই সুদিন আসিবে। "চিরদিন কখনও সমান না যায়" আমাদেরও এমন দিন যাইবে না। আমরাও উচ্চবংশ সম্ভূত, জগৎকে দেখাও যে আমরাও জগতের সভ্যতম জাতির বংশধর হইবার অনুপযুক্ত নই। কার্য্যই মূল; কার্য্য কর, আর ভগবানের নিকট যোড়হস্তে, একাগ্রভাবে প্রার্থনা কর—"আমাদের সুমতি হউক।" তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে, আমরাও আবার, সভ্যতম জাতির উপযুক্ত বংশধর বলিয়া জগতে মাননীয় হইব।—জয় ভগবান!! অলম্!!

"চরিত্র—একতা।"

শিক্ষা হইতেই চরিত্র এবং চরিত্র হইতেই একতার উৎপত্তি। যাহার যেরূপ নীতিশিক্ষা হইয়াছে তাহার সেইরূপই চরিত্র হইবে। কেহ বা শিক্ষা ও সংসর্গদোষে দস্যু কেহ বা শিক্ষা ও সংসর্গের গুণে ধার্ম্মিক চূড়ামণি। ধার্ম্মিকে দস্যুতে প্রকৃত প্রণয় জন্মিতে পারে না। তাহাদের প্রকৃতিই যে ভিন্ন। একের এক বিষয়ে অনুরাগ, অন্যের তাহাতে বিরাগ। কাজেই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত একতা জন্মিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এক একটী মানব লইয়াই মানবজাতি। প্রত্যেকের চরিত্র সংশোধিত না হইলে জাতীয়চরিত্র গঠন হইবে

কিরূপে ?. চরিত্রগঠন করিতে হইলে নীতিই প্রধান অবলম্বন। যিনি যতগুলি সুনীতি জীবনে সন্নিবেশিত করিতে পারিয়াছেন তিনিই তত পরিমাণে চরিত্রবান। চরিত্রগঠন না হইলে মানব কোন কার্য্যেরই উপযুক্ত হয় না।

চরিত্র হইতেই একতার উৎপত্তি। একতা শব্দের অর্থ, —"একলক্ষ্য স্থির রাখিয়া, সকলেরই সেই লক্ষ্য সাধনে যত্নশীল হওয়া।"

একরূপ পোষাক পরিচ্ছদ পরিলেই একতা হয় না। তাই যদি হইত তাহা হইলে ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে রুষিয়ায় যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও একতা হয় না। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রুষিয়া জার্ম্মনী সকলেই খৃষ্টান, তবে সেখানে যুদ্ধের ভয় কেন ? রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট উভয়েই পাশাপাশী দণ্ডায়মান হইয়া অন্য পক্ষীয় সমধর্ম্মাবলম্বীদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে কেন ? মিশর যুদ্ধের সময় ইংরেজ পক্ষীয় মুসলমান সৈন্য অপর মুসলমান পক্ষের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই ত। জাতিগত পার্থক্যও প্রকৃত একতার বিরোধী নয়। শিখ, গুরখা, মুসলমান, ইংরেজ ইত্যাদি সকল জাতিই পরস্পর ভ্রাতৃভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। তাই বলি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধাদি সকলেরই প্রকৃত একতা (একাকার না হইয়াও) জন্মিতে পারে,—এককালে জন্মিবেই। "শিক্ষাদি" যেমন একতার (একলক্ষ্য হইবার) প্রধান

ায়, তেমনি 'দেশের শাসনও।' যাহারা যে দেশের অধি-
ী এবং যে দেশ একই শাসনে শাসিত, তাহাদের মধ্যে
কতা হওয়াই স্বাভাবিক। ভগবান যাহা করিয়াছেন, তাহা
আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই, তাহাতে অণুমাত্রও
শয় নাই। সমগ্র ভারত আজ ইংরাজ-শাসনাধীন, কাজেই
রতের একতা হওয়া বা ভ্রাতৃভাব জন্মান সুদূরপরাহত
।

একতা না জন্মিলে মনুষ্যের কোন বিশেষ কার্য্য করিবার
তা জন্মে না। তাই আমাদের এখন চরিত্র গঠন করা,
ই আবশ্যক হইয়াছে। আমরা পূর্ব্ব আদর্শ—"একতার মূল
িত্র" ভুলিয়া গিয়াছি!! এই অন্ধকারে আমরা যদি
জের অবস্থা নিজে না বুঝিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের
র মঙ্গল কোথায়?

একতার মূল চরিত্র। আর চরিত্র গঠন করিতে হইলে
প্রধানতঃ নীতিই অবলম্বন। ইহাতে ব্যর্থ হইলে, আমাদের
জীবনই ব্যর্থ হইবে, ইহা মনে রাখিয়া অগ্রসর হইলে, কালে
আমরা আবার মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে সক্ষম হইব না কি?

"ধর্ম্ম" । *

ধর্ম্মই মনুষ্য জীবনের ভিত্তি। যাবতীয় মনুষ্য জাতিরই ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্ম আছে বলিয়াই মানুষ—মানুষ। ধর্ম্মের দ্বারাই আমরা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করিতে বা 'মোক্ষ' লাভে সমর্থ। অন্য কেহই এই চরম পদের অধিকারী করাইতে সমর্থ নয়। এইহেতু ধর্ম্মই আমাদের একান্ত সাধনীয়।

---

* আমরা যে যে গুণ অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকি তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অর্থে সর্ব্বদাই গুণসমূহ বুঝাইয়া থাকে। মানবজীবন কতকগুলি গুণের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যিনি যত অধিক পরিমাণে সদ্গুণাবলীর অধিকারী, তিনি তত অধিক ধার্ম্মিক। তবে কোন্‌টা সৎ আর কোন্‌টা অসৎ ইহা বিবেচনা করা সহজ নহে। সমস্ত মানবজাতির ভবিষ্যৎ যিনি নির্দ্দেশ করিতে পারেন, ইহা তাঁহারই পক্ষে কথঞ্চিৎ সম্ভব। তাই শাস্ত্রীয় বাক্যাবলীতে বিশ্বাস করাই সমীচীন।

আর একটা কথা বহু দিন হইতে ধর্ম্ম-অর্থে মোটামুটি—"ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন, সামাজিক বিধি ব্যবস্থাদির প্রতিপালন"—ইত্যাদি বুঝাইয়া আসিতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ ঐ সকল এক একটী উচ্চ অঙ্গের সদ্গুণ বই আর কিছু নয়। ধর্ম্ম বলিলে আর কিছু না বুঝিয়া কেবল ঐ টুকু বুঝিলেও যে একরূপ যথেষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কারণ একমাত্র ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহার তুষ্টিসাধনার্থে সংসারে বিচরণ করিতে পারিলে মানব যে বাস্তবিকই উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারে তাহা নিঃসন্দেহ।

যে গুণ সমূহ মনকে সচ্চিদানন্দ অবস্থায় রাখিতে পারে, তাহাই উচ্চগুণ বা ভাষা কথায় "ধর্ম্ম।" আমাদের লক্ষ্যই ব্রহ্ম, অতএব যে গুণ সমূহ আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখে ;—মনকে সচ্চিদানন্দময়—[সৎ—(নিত্য, পরিবর্ত্তনশীল নয়) ; চিৎ—বিশুদ্ধ চৈতন্য- (জ্ঞান) ; (ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ নয়) ; আনন্দ—বিমল আনন্দ, (যে আনন্দ অবসাদ আনে না)—অবস্থায় উপনীত করাইতে সমর্থ তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহাই এক কথায়—'ধর্ম্ম'।

যিনি যে শাস্ত্রের নিয়ম প্রতিপালন করেন, তিনি সেই শাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষক আখ্যায় অভিহিত হন। যিনি হিন্দু শাস্ত্রের নিয়মানুসারে চলিয়া থাকেন তিনিই হিন্দু। যিনি খৃষ্ট শাস্ত্রের নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন তিনিই খৃষ্টান। যিনি মহম্মদীয় শাস্ত্রের নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তিনিই মুসলমান। এইরূপ সমস্তই ;—কিন্তু যিনি হিন্দু হইয়া হিন্দুর নিয়মাবলী, মুসলমান হইয়া মহম্মদীয় নিয়মাবলী, খৃষ্টান হইয়া খৃষ্টের নিয়মাবলী, বৌদ্ধ হইয়া বুদ্ধের নিয়মাবলী, শিখ হইয়া নানকের নিয়মাবলী প্রতিপালন না করেন, তিনি যাবতীয় মনুষ্য সমাজেরই ঘৃণার্হ এবং অনিষ্টকারক। বিদুষী "আনি বেশান্ত" হিন্দু ধর্ম্মের নিয়ম প্রতিপালন করেন, আমরা তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিতে পারি ; কিন্তু হিন্দু বলিতে পারি না। জন্মে ও কর্ম্মে যে হিন্দু সেই-ই হিন্দু, অপরে নয় ;—হিন্দু ধর্ম্মের এইটুকুই বিশেষত্ব। অবশ্যই স্বীকার করিব, "বেশান্ত" মহোদয়া যেরূপ ভাবে হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন, তাহাতে তিনি আমাদের অনেকের মধ্যেই পূজনীয়া, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার সহিত আমাদের আহার ব্যবহার করিবার ক্ষমতা নাই। সে সব ক্ষমতা এখন লুপ্ত। আপাততঃ আমাদিগের ন্যায় শোচনীয় অবস্থা অন্য কাহারও আছে কি না সন্দেহ। এক সময়ে যে জাতি জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল, যাহাদের বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ, দর্শনাদির কিয়দংশ মাত্র উপলব্ধি করিয়া, এখন পাশ্চাত্য জ্ঞানিগণও

ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি লইয়া দণ্ডায়মান, আর আজ আমাদের—তাঁহাদের বংশধরগণের সে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবারও ক্ষমতা নাই।—ধিক্।

মোটামুটি ধর্ম্মকে তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। "সাধারণ নীতি" ; "সমাজ ধর্ম্ম ;" এবং "উপাসনা।" মানব মাত্রেরই নীতি-ধর্ম্ম সাধারণ। "পরদ্রব্য গ্রহণ দূষণীয়"—ইহা সার্ব্বজনীন নীতি। কিন্তু সমাজ ধর্ম্ম ও উপাসনা ধর্ম্ম সকলেরই এক নয়। যাঁহাদের সমাজ যে ভাবে গঠিত,যে সমাজের অভাব যত কম, যে সমাজের লক্ষ্য যেরূপ সে সমাজের নীতিও তদনুযায়ী। কিন্তু তাহা হইলেও এই তিন ধর্ম্মাংশই (সাধারণ নীতি ; সমাজ ; এবং উপাসনা) পরস্পরের সহিত এতই বিজড়িত, এতই ঘনিষ্ঠ ভাবে সংবদ্ধ, যে একের লোপে অন্যের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নাই। মানবহৃদয়মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে এই তিনটী ক্রমই গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে। বিকাশ হইলেই সাধনা সুগম হয়। কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান, কি হিন্দু, কি মুসলমান ইত্যাদি প্রত্যেকের পক্ষেই প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে প্রথমেই আত্মোন্নতির প্রয়োজন। ব্যষ্টির আত্মোন্নতিই, সমষ্টির উন্নতির মূল। আর এই আত্মোন্নতির সম্পূর্ণতা ধর্ম্মে*। সেই হেতুই "ধর্ম্মই একান্ত সাধনীয়"—একথা বারংবার বিশেষ করিয়া বলাই বাহুল্য। তবে, যিনি

* ঈশ্বর ভক্তিতে। তাঁহাকে তুষ্টার্থে কোন কার্য্য করিতেছি ভাবিয়া কার্য্য করিলে কখনই পাপজনক হইতে পারে না। কারণ তিনি নিত্যসৎ।

যে সমাজাশ্রিত তিনি সেই সমাজেরই বিধি অনুযায়ী চলুন; যিনি সমাজদ্রোহী কার্য্যতঃ তিনি ধর্ম্ম দ্রোহী বা পাপী। * যিনি সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও তৎ সাম্প্রদায়িক বিধি উল্লঙ্ঘন করেন তিনি যে মানব মাত্রেরই ঘৃণার্হ, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

বর্ত্তমান কালে ধর্ম্মের আশ্রয় নাই। পূর্ব্বে রাজগণ ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখন যেমন পাশ্চাত্য প্রদেশে রাজা ধর্ম্মের প্রতিপালক, ধর্ম্মমন্দিরাদি রাজতত্ত্বাবধানে রক্ষিত—তখন আমাদের এ দেশেও তাহাই ছিল। এখন রাজা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কার্য্য করিবার ভার আমাদের সমাজের মধ্যেই অর্পণ করিয়া নিজে দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছেন; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, সমাজ এখন এক মাত্র ধর্ম্মের আশ্রয় হইলেও একপ্রকার নাই বলিলেও হয়! যাহা আছে তাহা কেবল স্বার্থপরতাপূর্ণ কূট দলাদলীর যন্ত্র বিশেষ। বিদেশীয় সমাজ নিজের হিতের জন্য কি করিতেছেন, দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না?—সমাজ জাগ্রত কর। নিজেরা

* পাপ কাহাকে বলে?—যাহা..আমাদের লক্ষ্যবস্তু হইতে দূরে লইয়া যায়। আমাদের লক্ষ্য—মুক্তি। সুতরাং যে কার্য্য তাহা হইতে (ব্রহ্মবস্তু—সচ্চিদানন্দময়ত্ব হইতে) দূরে লইয়া যায় তাহাই পাপ। আর ইহার বিপরীতই পুণ্য।

এখানে বলিয়া রাখি, আমিও বোধসৌকর্য্যার্থ প্রচলিত অর্থে 'ধর্ম্ম' শব্দের ব্যবহার করিয়াছি। স্থান বিশেষে একটু আধটু প্রভেদ হইতে পারে এই মাত্র।

জাগরিত হও, তাহা হইলেই সমাজ জাগ্রত হইবে। জাগরিত হইতে হইলে, আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে পল্লবগ্রাহিতা, কপটতা ও আত্মম্ভরিতা রূপ দোষ ত্রয়কে দূরীভূত করিতেই হইবে। আমরা এতই পল্লবগ্রাহী ও কপট হইয়াছি যে, আমাদের ধর্ম্ম কার্য্যেও গভীরতা নাই। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য আছে, কিন্তু বিলাসিতা ছাড়া নয়। (অবশ্য অনেকে এমন আছেন, যে বাস্তবিকই তাঁহাদিগকে দেখিলে বিলাস দূরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু আমি "সাধারণের" কথা বলিতেছি, এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় "বিশেষের" কথা না বলিবারই চেষ্টা করিব।) হয়ত সন্ধ্যা বন্দনাদি করা আছে, কিন্তু আন্তরিকতা নাই। এইরূপ ও অন্যরূপ দোষ গুলি হইতে আগে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলে, যখন যাহা ইচ্ছা হইবে, তদ্দণ্ডেই তাহা সাধন করিতে পারা যাইবে। তাই এখন শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ বুঝিয়া শাস্ত্র সঙ্গত কার্য্য কর। শাস্ত্র স্বাস্থ্য ও মন উভয়েরই উপযোগী। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া মহর্ষিরা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। আমরা স্বল্পবুদ্ধি, তাই আজ সেই সকলের তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছি। এই যে সন্ধ্যা আহ্নিক ব্রাহ্মণাদির অবশ্য কর্ত্তব্য কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর নিতান্ত জটিল। আমার মত মূর্খের এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। তবে এ বিষয়ে আমাদের যাহা মতামত তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি মাত্র। ক্ষমিগণ ক্ষমা করিবেন।

সামান্যতঃ "মন" স্থির করিয়া, দুঃখ শোক তাপ বর্জ্জিত করিতে পারে যেমন সুষুপ্তি; তেমনি "মন"কে পূর্ণ স্থির রাখিয়া, সদানন্দময় ভগবদ্দর্শন করাইতে একমাত্র "চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ"ই সক্ষম। * কিন্তু সুষুপ্তি যেমন একরূপ বিধাতার সাধারণ দান, এটী তেমন নয়; ইহা মানবের ঐকান্তিক পরিশ্রম সাধ্য। ইহার প্রধান অবলম্বন একাগ্রতা। সদা চঞ্চল মনকে কোন বিষয়ে বদ্ধ করাইতে হইলে অর্থাৎ সে বিষয়ে একাগ্রতা লাভ করিতে হইলে, সদা সর্ব্বক্ষণই চেষ্টার প্রয়োজন। কিন্তু সাংসারিক মানব সর্ব্বদা নানা কাজে ব্যস্ত। সকল সময়েই তাহার গভীর একাগ্রতা লাভ সম্ভব নয় বলিয়াই অন্ততঃ দিবসে তিন বার করিয়াও ভগবানকে গভীর ভক্তি ভরে স্মরণ করিবার প্রথা। এস্থলে মোটামুটি একটী প্রশ্ন হইতে পারে,—আমার ভক্তি থাকিলেই হইল, অত মন্ত্র তন্ত্রাদির উচ্চারণ কেন?

প্রেমের নামান্তরই ভক্তি। সুন্দরী যুবতীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত বৃদ্ধের যে প্রেম প্রদর্শন, অথবা পরকীয়া নারীর নায়কের প্রতি যে ভাব তাহাই ভক্তি।—সে যেমন, সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকিতে চায়, যত কিছু ভাল জিনিষ তাঁহাকেই

* চিত্তের গতি অন্যান্য দিক হইতে প্রতিবন্ধ করিয়া এক পথে নিয়োজিত করিতে পারিলেই—মন কেন্দ্রীভূত হয়। মন কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলেই সাধনা সুগম।

দিয়া সন্তুষ্ট হয়, তাহারই উপদেশ মত সমস্ত কার্য্য করে, তাহাকে না দেখিয়া একদণ্ডও থাকিতে পারে না, এক কথায় সে যেমন তাহাতে আত্মবিসর্জ্জন করে ; তেমনি ভাবে ভগবানে আত্মবিসর্জ্জনই—ভক্তি। জন্মান্তরীণ স্কৃতি না থাকিলে ভক্তি কি বিনা কর্ম্মে আপনা আপনিই উপস্থিত হইতে পারে ? "কর্ম্ম"—"জ্ঞান"—"বিশ্বাস"—"অভ্যাস"—"ভক্তি"—এ ক' টী পরস্পরের ক্রম বিকাশ। সেই জন্যই উক্ত হইয়াছে—"ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ"। কিন্তু আগে কর্ম্ম পরে যা কিছু। হঠাৎ আপনা আপনিই ভক্তি আসিতে পারে না। কর্ম্মই ভক্তির প্রথম সোপান। অতএব একাগ্রতা (ভক্তিরই অংশ) বিনা কর্ম্মে জন্মিতে পারে না। সুতরাং ইহাতে স্থিরীকৃত হয় যে ভক্তির প্রয়োজন আছে এবং আমার কর্ম্ম দেখিয়াই আমার ভক্তি আছে কি না তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখন দেখা যাউক মন্ত্রের প্রয়োজন আছে কি না ?

ধরে লও আমি "ক" কে ক্রোধভরে শালা বলায় সে রাগ করিল। আবার স্নিগ্ধভাবে "ভাই" বলায় সে সন্তুষ্ট হইল। কেন হয় ? আমি ত তাহাকে শারীরিক স্পর্শও করি নাই ? আমি দুইটী শব্দের দ্বারায় তাহার মনের পৃথক পৃথক শক্তিদ্বয়কে আহ্বান করিয়াছি মাত্র। আমার ভাব বা উদ্দেশ্যে এবং বাক্যে সে বিরক্ত বা সন্তুষ্ট হইয়াছে মাত্র। ইহাতে বুঝা যায় প্রাণের উচ্ছ্বাস মুখে বলিতে হইলে (ভাব ত

চাই-ই) তৎসঙ্গে উপযুক্ত শব্দেরও আবশ্যক। [কিন্তু অন্তর্যামী তিনি, ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে না পারিলেও অন্তরের ভাবমাত্র গ্রহণ করেন,—তাই কথায় বলে "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।"] আরও এস্থলে শব্দের এবং সুউচ্চারণের শক্তি দেখ। আমি যদি শালার স্থলে "শলা" বা "শলা" বা "শাল" এবং রাগতভাবে না বলিয়া হাস্যচ্ছলে বলিতাম সে রাগ করিত কি? অর্থাৎ তাহার ঐ শক্তি জাগরিত হইত কি?—কথনই না। ইহাতেই সুউচ্চারণের শক্তি বুঝিয়া লও। আর এই সব কারণেই বোধ হয় মন্ত্র এবং মন্ত্রের সুউচ্চারণ একান্ত প্রয়োজনীয়। সন্ধ্যার মন্ত্র সকলও এরূপ বিধি বদ্ধ যে তাহাতে একাগ্রতা আনিবেই আনিবে। তবে সন্ধ্যায় যে সমস্ত ক্রীয়াদির উপদেশ আছে, তাহা যোগ সাপেক্ষ্য। সম্যক সফলতা লাভ করিতে হইলে যোগক্ষম তত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উপদেশ লওয়া কর্ত্তব্য। তবে আমরা যাহা করি, তাহাও মন্দের ভাল, আংশিক উপকার পাইবই পাইব। শাস্ত্রেই বলে "অকরণাৎ মন্দ করণম্ শ্রেয়ঃ।

ভাই, সমস্ত শাস্ত্রীয় আদেশবাক্যেরই নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। আধুনিক প্রকৃতি পরিচর্য্যার গতিই স্বতন্ত্র। এথন নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া তাহারই পরিপূরণার্থে অতীব অপ্রাকৃতিক অভাবেরও অধিনতা স্বীকার করিয়া তাহারই তুষ্টার্থে প্রকৃতি নিয়োজিত। কিন্তু তথন প্রকৃতি—অভাবের অধিনতা স্বীকার না করিয়া, অভাবকেই অধিনে রাখিয়া, তাহারই উপর

প্রভুত্ব করণার্থেই নিয়োজিত। একটী প্রকৃতির প্রতি যোগী—ক্ষনস্থায়ী—বহির্মুখীন ; অপরটি প্রকৃতির সহযোগী—অবিনশ্বর—অন্তর্মুখীন। * তাই আমাদের ঋষিগণ প্রকৃতির অন্তর্মুখীন গতিরই পক্ষপাতী। আর তাঁহাদের সম্পাদ্য নীয়মাবলিও সেই ভাবেই গ্রথিত হইয়াছে, এখন যে আমাদের কি মানসিক কি শারীরিক অবস্থা ক্রমেই অবনত হইতেছে তাহারও অন্যতম কারণ, শাস্ত্রাদির বিধি ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন। ভাই সব, "ফু—" বলিয়া কোন বিষয় উড়াইয়া দিও না। বেশ প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝিবার চেষ্টা কর ; নিজে না পার সদ্গুরুর অনুসন্ধান কর, কিন্তু হঠাৎ ওটা কিছু নয় বলিয়া কদাচ উপেক্ষা করিও না। বিনা কারণে কার্য্য কদাচই সম্ভব নয়। †

সংযম ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান সহায়। সেই জন্যই আমাদের ঋষিগণ বারম্বার সংযমের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন। উশৃঙ্খল হইলে সকল বিষয়েই অনিষ্টপাত হইয়া থাকে। ধর্ম্মা-

---

* অভাবের নিকট পরাভূত না হইয়া অভাবকে পরাজিত করাই শ্রেয়ঃ। সোজাসুজি বিচার করিয়া দেখিলেও কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ প্রণিধান করা শক্ত নয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীর অসুস্থ হয়, তাই বলিয়া কি দিবা রাত্রি জামাজোড়া পড়িয়া একটুকুও খোলা গায় বাহির না হওয়া অপেক্ষা ক্রমে-ক্রমে ঠাণ্ডা সহ্য করা ভাল নয় ?

† নিয়তই যদি উদরান্নের জন্য ব্যস্ত থাকিতে না হয় তাহা হইলে "দিন-চর্য্যা" নামক পুস্তকে এ সব বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। তবে আমাদের দ্বারা ইহার সম্পূর্ণতা সম্ভব নয়, উপযুক্ত ব্যক্তি অগ্রসর হউন; আমরা তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

ষ্ঠান ত হয়ই না। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কৃত-কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আর কখনও সেরূপ কার্য্য করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা; যদি সামর্থ থাকে, উপায় থাকে, সুযোগ থাকে, নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, মুক্তকণ্ঠে নিজ পাপ স্বীকার করা এবং অর্থ দ্বারাতেই হউক বা যেমন করিয়াই হউক, ক্ষতিপূরণ করার নামই অনুতাপ। এতটুকু হইলে তবে প্রকৃত অনুতপ্ত হওয়া হয় এবং প্রতিজ্ঞারও ক্ষমতা জন্মে এবং দৃঢ়তা থাকে। নচেৎ শুধু স্তিমিতনেত্রে বসিয়া থাকা, অনুতপ্তের চিহ্ন কি না বলিতে পারি না। যাহার হৃদয় অনুতাপানলে শোধিত, শীঘ্রই সে একাগ্রতা লাভ করে। একাগ্রতা হইলেই মানবের সকল কার্য্যই সুফলপ্রদ হইয়া থাকে। একাগ্রতার নিদর্শন স্বরূপ নিম্নে গিরিবালা যোগিনীর বিষয় লিখিত হইল। ভারত যে এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ন ব্যক্তিশূন্য নয়, ইহা তাহারই একটী উজ্জ্বল প্রমান।

গত ১৩০৪ সালে অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। ঘটনাটী এই—হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে ইহাঁর শ্বশুরালয়। ইনি অতি অল্প বয়সেই বিধবা হন। একদিন শ্বশুরালয়ের বয়স্থা রমণীরা সকলেই ৺তারকেশ্বর দেব দর্শনার্থ গমন করেন। গিরিবালাও যাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু, অভিভাবক যাইতে দেন নাই। এলোকেশীর ঘটনার পর হইতে সকলেই একটু সঙ্কুচিত হন বৈ কি। যাই হউক, গিরি-

বালা যাইতে না পাইয়া, মর্ম্মাহত হইয়া গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া একমনে ৺শম্ভুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভোররাত্রে ৺শম্ভু তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন ; ইনি এখন শাস্ত্রাদিতে বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে অক্ষর পরিচয় মাত্রও ছিল না। মধ্যে মধ্যে বর্দ্ধমানে দেবীর দর্শন পাওয়া যায়। ইহাঁর এক ভাই এখন এম, এ, পাশ করিয়াছেন।” ইহা লেখকের কাল্পনিক কথা নয় প্রকৃত সত্য। বাস্তবিকই যদি প্রকৃত ব্যাকুলতা জন্মিয়া থাকে “অমৃতবাজার” অফিসে খোঁজ কর, সন্ধান পাইবে। এমন অনেক ঘটনার কথা এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারিত, কিন্তু এখন ইহাঁরা উভয়েই জীবিত বলিয়া ইহাঁদের কথাই সন্নিবেশিত হইল। পূর্ণ একগ্রতা হইলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ নিঃসন্দেহ। ঋষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন অবিচলিত, অসন্দিহান চিত্তে তাহাই সম্পন্ন কর। তখন এত কাগজ কলমও শস্তা ছিল না ; তোমার আমার মত লোকের কথাও গ্রাহ্য হইত না। শতবৎসর অনাহারে অনিদ্রায়, কালযাপন করিয়া, তাঁহারা শুধু মানব হিতার্থে এই সকল নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তখন বই বিক্রি হইত না, তাঁহারা পয়সার লোভেও লিখিতে যান নাই। যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, সাধারণের হিতার্থে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। এ নিস্বার্থ পরোপকার— ইহাতে পূতিগন্ধময় স্বার্থের লেশ নাই। তাঁহারা যাহা চেষ্টা, অধ্যবসায়, দূরদর্শন বলে স্থির করিয়াছেন, আজ আমরা

তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অথচ আমরা সেই মহাপুরুষ-দিগেরই বংশধর !!! হায় ;—কি শোচনীয় অধঃপতন !!

হিন্দু ধর্ম্মই অর্থাৎ হিন্দু অবলম্বিত গুণাবলীই (অবশ্য উপাসনা-হিসাবে), যে পৃথিবীর মধ্যে সত্য (মোক্ষপারক,) আর অন্য সকল ধর্ম্মই মিথ্যা, তাহা বলিতেছি না। সকল ধর্ম্মই সত্য। ঈশ্বর যে কেবল হিন্দুদিগের মধ্যেই আছেন, অন্য কোথাও নাই; ইহা কখনও হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বত্রই আছেন এবং থাকিবেন, তবে কি হিন্দু কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খ্রীষ্টান, যিনি যে শাস্ত্রের পৃষ্টপোষক তিনি দৃঢ়তা সহকারে তাহাই প্রতিপালন করুন, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুযুক্তি। হিন্দু প্রকৃত হিন্দু হইলে, মুসলমান, প্রকৃত মুসলমান হইলে, বৌদ্ধ প্রকৃত বৌদ্ধ হইলে খৃষ্টান প্রকৃত খৃষ্টান হইলে, সংসারের অনেক অনুশীলনীই অতীব সহজে সমাধান হইয়া যায়। ধর্ম্মই (মূলতঃ—ঈশ্বর ভক্তিই —কারণ ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চগুণ), প্রকৃত তেজ প্রদানে সমর্থ। এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে তরবারী লইয়া মহম্মদীয় শিষ্যগণ "দীন্" "দীন্" রবে জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। রোমীয়গণের ধর্ম্মহীনতাই—অবনতির প্রধান কারণ। তাই বলি সকলেই স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা কর। আত্মোন্নতিই উন্নতি নিদান আর ধর্ম্মেতেই আত্মোন্নতির সম্পূর্ণতা। ভাই সব অধর্ম্মাচরণ করিও না। তবেই সমাজ জাগ্রত হইবে; তোমরাও আবার অচিরে ভারতের উপযুক্ত সন্তান

বলিয়া, সম্মানিত হইয়া ঐহিক পারত্রিকে মঙ্গল লাভ করিবে। আবার তোমাদের যশোরাশীতে জগৎ বিস্ফারিত হইবে। ভগবান পদে আত্ম-বিক্রয় কর। আর একাগ্র ভাবে প্রর্থনা কর, যেন ধর্ম্মে স্থিরমতি থাকে। ত্রিবিধ দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি বা মোক্ষপদ লাভ করাইতে একমাত্র ধর্ম্মই সক্ষম। সর্ব্বাঙ্গীন সুখী হইতে হইলে ধর্ম্মই (মূলতঃ—ঈশ্বর ভক্তিই) যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তাই অন্তরে অন্তরে গাঁথিয়া রাখ "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ।"—তবেই সুফল লাভ করিয়া আবার মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারিবে; নচেৎ অন্য সহস্র চেষ্টাতেও প্রকৃত উন্নত হইতে কদাচ সক্ষম হইবে না। তাই আবার বলিতেছি, শিক্ষা হইতেই চরিত্র, চরিত্র হইতেই একতা এবং এই সকলের সহিত ধর্ম্ম সম্মিলনই (ঈশ্বর তুষ্টার্থ কার্য্য করিতেছ—এই ভাবই) প্রকৃত উন্নতি নিদান—ইহা ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কখন সম্ভব হইবে না।—ইহাই আমাদের শেষ কথা।

ভাবুক! একবার মানস নেত্র উন্মীলন করিয়া ভাব দেখি আমরা কোথায় হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। এক কালে যে দেশের সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্তও অতিথি সৎকার না করিয়া জল গণ্ডুষ গ্রহণ করিত না, অভ্যাগত ব্যক্তির পরিতোষার্থে স্বীয় অন্ন ত্যাগ করিয়া, সমস্ত দিন অনাহারে থাকিতে বিন্দুমাত্র ক্ষোভিত হইত না, আজ তথায়—"আমার ছেলের জল যত্ন হয় না,—বেশী দুধ পায় না, আমার পরিবার

কষ্ট পায়''—ওজরে এক মাতৃগর্ভোৎপন্ন, চিরকাল এক সঙ্গে বর্দ্ধিত সহোদরের সহিত জন্মের মতন বিচ্ছিন্ন হইতেছে! হায়,—ক্ষুদ্র স্বার্থের কি দুর্দ্দমনীয় প্রতাপে আজ সমগ্র ভারত ভূমি প্লাবিত! যে দেশে লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আজ সেই দেশে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই"—প্রবাদ বচনে পরিণত! সামান্য একটু ধৈর্য্য, সামান্য একটু উদারতায় যে সংসার পবিত্র শান্তির নিকেতন হইতে পারিত, আজ তাহার অভাবে সেই সংসারই পিশাচের বিকট তাণ্ডব ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত। ভারতের সুখ শান্তি সুদূর সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত; আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট, তাই অশান্তি রূপিণী পাপ-সহচরী রাক্ষসীর নিষ্পীড়নে নিপীড়িত—বিপর্য্যস্ত। যে দেশের পিতৃভক্তির আদর্শ—রামচন্দ্র, ভ্রাতৃ ভক্তির আদর্শ—ভরত, দানবীরের আদর্শ—কর্ণ, যোদ্ধার আদর্শ ভীমার্জ্জুন, দৃঢ়তার আদর্শ—ভীষ্ম; দয়ার আদর্শ—বুদ্ধ, সংযমের আদর্শ—শুক-দেব, প্রেমের আদর্শ—গৌরাঙ্গ; ভক্তের আদর্শ—প্রহ্লাদ; রাজনৈতিকের আদর্শ—চাণক্য;—হায়! সে দেশের সন্তানগণ এতই অধঃপতিত!! যে দেশের ললনাগণের স্নেহের আদর্শ—যশোদা, আত্মবিসর্জ্জনের আদর্শ—রাধা, কোমলতার আদর্শ—সীতা, সতীর আদর্শ—সাবিত্রী সেই দেশের কুলকামিনীর কি এখনও অধঃপতনের সীমা হয় নাই! যে দেশের কবি—ব্যাস বাল্মিকী; যে দেশের বীণায় গভীর স্বরে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী''—নিনাদিত হয়, সে দেশ কি

কেবলই "খোকার খেলা"—"খুকির বই"—লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে? যে দেশে কোহিনুর উৎপন্ন হইয়াছে সে দেশ কি চিরকালই দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর করে জর্জ্জরিত হইতে থাকিবে?—ভগবান! আর কি সে দেশ ধন-ধর্ম্ম-পরিপূরিত দিক্ পরিপূর্ণ যশোরাশী-উদ্ভাসিত হইবে না? আর কি সে শান্তি-প্রদায়িনী, কর্ম্মোদ্ভাসিত ঋষির পবিত্র বেতস-কুঞ্জ দেখিতে পাইব না?—প্রভো! হৃদয় অবসন্ন, কি আর বলিব, কিন্তু যখন হৃদয়তন্ত্রী আঘাত করে, তখন ক্ষুব্ধচিত্তে কর্ম্মনিয়ন্তা তোমাকেই সম্বোধন করিয়া হৃদয় যে স্বতঃই বলিতে চায়,—

যেই দেশ ছিল, প্রভো, শান্তির আগার,
সকলি আনন্দময়,
কিছুই বিষাদ নয়,
নিরাশা আঁধার কিছু ছিল না গো যার
এই সে ভারতভূমি,—হবে তা'কি আর?

দয়াময়, তোমার ইচ্ছাই সম্পূর্ণ হউক। কিমধিকমিতি।

১ম পরিশিষ্ট।

কংগ্রেস ও স্বরাজ।

জাতীয় মহাসমিতি আজ প্রায় তেইস বৎসর উদ্বোধিত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে যে কিছুই কাজ হয় নাই তাহা নহে, তবে যতটুকু আশায় ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় তাহার একাংশও পূরণ হয় নাই ইহা যথার্থ। কংগ্রেস মণ্ডপে উপস্থিত তৎকালীন বিষয়ের বক্তৃতা শ্রবণান্তর এক করতালি প্রদান ভিন্ন ইহার যে আর কিছু উচ্চতম লক্ষ্য আছে তাহা অনেকেই ধারণা করেন না। এখনকার কংগ্রেস জন কতক ইংরাজী নবিস বাবুদের।* বাস্তবিকই জনসাধারণ কংগ্রেস কি? ইহার উদ্দেশ্য কি? ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ

---

* এস্থলে এরূপ কথা বলিয়া রাখা উচিত এরূপ বৃহৎ রাজকীয় সভায় মতদ্বৈধ থাকাই সুফল প্রসূ এবং ইংরেজী ভাষাতেও কথোপকথন দূষনীয় নয়।

হঠাৎ ইহা আপাত দৃষ্টিতে "মতদ্বৈধ বিশিষ্ট সংসারের হিত হওয়া কদাচ সম্ভবপর নয়"—১২ পৃষ্ঠা; এ কথার প্রতিবাদ জনক মনে হইতে পারে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, মতদ্বৈধ থাকা ভাল; কিন্তু বিচার করিয়া যে মত ভাল তাহাই কার্য্যতঃ অবলম্বনীয়। ক্ষুদ্র সাংসারিক বিষয়ে তাহা সকল সময় সম্ভব নয়। বৃহৎ ব্যাপারের গতি সকল সময়ই ধীর স্থির। ক্ষুদ্র বিষয়ের ব্যাপার সাধারণতঃ দ্রুত গতিতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সংসারে পিতা অন্যায় আদেশ করিলেও পুত্র পালন করিতে বাধ্য কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে কেহই আদেশ করিতে পারেন না, সকলেই আপন আপন বক্তব্য প্রকাশ করিবার অধিকারী মাত্র। গৃহে গৃহস্বামীই সর্ব্বময় প্রভু, তাঁহার মতামতই শিরোধার্য্য, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিই কোন

কোথা হইতে আইসে? উদ্ধৃত অর্থ কি ভাবে ব্যয়িত হয়, লোকসান হইলে কে তাহার ক্ষতিপূরণ করে ইত্যাদি বিষয় জানে না,—অন্ততঃ বঙ্গের সম্বন্ধে একথা অলীক নয়। * কংগ্রেসে প্রজা সাধারণের মতামত কিছুই প্রকাশ পায় না। সত্য কথা বলিতে কি ইহার মূল লক্ষ্য যে "স্বরাজ", আর ইহা যে ভারতবাসীর একান্ত ন্যায় সঙ্গত দাবী তাহাও তাহারা জানে না। (হাইকোর্টের জজেরাও ইহাকে জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত দাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন)। কাজেই স্বীকার করিতে হয় ইহা এখন জনসাধারণের মতামত প্রকাশের স্থান না হইয়া জন কতক আশা-উদ্বিগ্ন ব্যক্তির সম্মিলন ক্ষেত্র মাত্র। সুতরাং ইহা জন-সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ নয়। আর বস্তুতঃই

ব্যক্তির প্রভু নন; দশজনের বিচারে যে নিয়মস্থির হইবে সেই নিয়মই প্রভু। কাজেই কি রাজনীতিক্ষেত্রে কি গৃহাশ্রমে অবনত মস্তকে প্রভুর প্রতি উদ্দেশ্য পালন ভিন্ন কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়?

* কংগ্রেস উদ্ধৃত অর্থ হইতে এক খানি প্রাদেশিক ভাষায় ভাল সংবাদ পত্র সামান্য মূল্যে প্রকাশ করা উচিত। সংবাদ পত্রের প্রভাব সকল দেশেই খুব বেশী কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের প্রাদেশিক ভাষায় কোনরূপ সংবাদ পত্রই নাই। যাহা আছে তাহা কেবল ছাপিট বিজ্ঞাপন ও কতকগুলা অসার বিষয়ের চর্ব্বিতচর্ব্বণ এবং গালাগালীর কূট যন্ত্র বিশেষ। কি সাহিত্য চর্চ্চা, কি শিল্প চর্চ্চা, কি বিজ্ঞান চর্চ্চা, কি ইতিহাস চর্চ্চা কি কৃষি চর্চ্চা, কি বাণিজ্য বিষয়ক কোন উপকারই ইহার দ্বারা হয় না। যাহাতে এই অভাব বিদূরিত হয়, কংগ্রেস হইতে তাহারই চেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে উচিত। সংবাদ পত্র লোক শিক্ষার্থে একথা ভুলিয়া থাকা উচিত নয়।

শিল্প প্রদর্শিনী না থাকিলে ইহার অস্তিত্ব এতদিন থাকিত কি না, যতটুকু স্থায়ীত্ব সম্ভাবনা হইয়াছে এতটুকুও হইত কি না, বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

কংগ্রেসকে প্রকৃত কার্য্যকরী করিতে হইলে যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই—সুদূর পল্লীস্থ সামান্য কৃষক পর্য্যন্তও ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে, এবং তাহারও যে ইহার একজন, কংগ্রেসে বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী প্রতিপালন করিয়া চলা উচিত, যেহেতু ইহার ইষ্টানিষ্টে তাহারাও যে শুভাশুভ ফলভোগী, তাহাদের মতামতও যে গ্রাহ্য তাহারা যাহাতে একথা বেশ পরিস্কার রূপে কার্য্যতঃ বুঝিতে পারে তাহারই উপায় করা আবশ্যক। দেশের মনিষী ব্যক্তিরা উপায় উদ্ভাবন করুন—কংগ্রেস মণ্ডপকে বাস্তবিকই অকৃত্রিম ভারতীয় জনসাধারণের সভা করিয়া ইহার তেজ শক্তি আরও বর্দ্ধিত করুন। প্রত্যেক গ্রামবাসীর মতামত সংগ্রহ করাও বিশেষ কষ্ট সাধ্য নয়। আমাদের বোধ ইহার সহজ উপায়ই আছে।

প্রগলভতা বলিয়া এখন প্রকাশে বিরত হইলেও আবশ্যক হইলে পরে উপায় নির্দ্দেশ করা যাইবে। দেশের জনসাধারণের নামে প্রচলিত অথচ জনসাধারণের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবল মাত্র জনকয়েকের মতামত লইয়া যদি কংগ্রেস পরিচালিত হয় তবে তাহার প্রতি যে অনেকেই আস্থাহীন ও "কঙ্গেস" বলিয়া ঠাট্টা করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

২য় পরিশিষ্ট।

গ্রাম্যফণ্ড ও ধর্ম্মগোলা।

প্রার্থীর কৈফিয়ৎ দেওয়াই সঙ্গত। ধর্ম্মগোলা স্থাপনার্থ এই অর্থ ব্যয়িত হইবে কাজেই ইহা দ্বারা কোন বাস্তব সুমঙ্গল সাধিত হইতে পারে কি না দেখা উচিত। কোন কোন নিয়মাবলী পরিচালিত হইলে বাস্তবিকই শুভফলপ্রসূ হইতে পারে তাহাই বিবেচ্য।

গ্রামের জমীদার এবং গ্রামের সাধারণ সকল ব্যক্তিরই নিকট হইতে চাঁদা করিয়া এবং এই প্রদত্ত অর্থের দ্বারা যতদূর সম্ভব ধান্যাদি সংগ্রহ করিয়া মজুত করা হইবে।

গ্রামের যে যে ব্যক্তি ইহাতে চাঁদা দিবেন তাঁহাদেরই মতানুযায়ী ইহার কার্য্য পরিচালিত হইবে। যদি কোন বিষয় লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়; যে পক্ষে বেশী মত হইবে তদনুসারেই ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে।

যে যে ব্যক্তিরা ইহাতে চাঁদা দিবেন তাঁহাদেরই 'বাড়ি' লইবার প্রথম অধিকার থাকিবে। যাঁহারা চাঁদা দিবেন না তাঁহাদের কোন বিষয়েরই অধিকার থাকিবে না। আর যিনি যত অধিক চাঁদা দিবেন তাঁহার অধিকার (বাড়ি লইবার পক্ষে মাত্র) সর্ব্বাগ্রে থাকিবে কিন্তু তিনি যাহা দিয়াছেন তাহার এক তৃতীয়াংশ জমা রাখিয়া ঐ অংশ লইতে পারিবেন। (অবশ্যই—

মোট ধান্যের পরিমাণের অংশানুযায়ী)। তদতিরিক্ত পাইবেন না। এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাড়ি সমেত আসল পরিশোধ করিতে হইবে। যিনি না দিবেন তিনি সমাজচ্যুত হইবেন। যদি পুনরায় নূতন করিয়া জমাদেন তাহা হইলে দুইয়ের তিন অংশেরই উপর তাহার বাড়ি লইবার দাওয়া থাকিবে মাত্র। এবং পূর্ব্ব ধান্য সমস্ত পরিশোধ দিতে হইবে।

যিনি যাহা দিবেন তাহাতে আর তাঁহার কোনই সম্পর্ক থাকিবে না। বস্তুতই ইহাকে নিজযত্নে পর সামগ্রী স্থিত-বস্তুর ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে।

যে কোন দুই ব্যক্তির উপর ইহার বাৎসরিক কার্য্যভার ন্যস্ত থাকিবে। পরে পূজার সময় পুনরায় সকলের মতামত অনুসারে যাঁহাদিগকে নিয়োগ করা হইবে তিনিই ঐ ভার লইতে বাধ্য থাকিবেন।

যাঁহারা গ্রামে থাকেন এরূপ ব্যক্তির হস্তেই কার্য্যভার অর্পিত হইবে কিন্তু বিশেষ কারণ ব্যতীত একই ব্যক্তি উপর্য্যুপরি দুই বৎসরের বেশী কার্য্যভার লইতে পারিবেন না।

কার্য্যকারকেরা প্রতি ছয়মাসে গ্রামস্থ চাঁদা-দাতৃদিগকে এবং যাহারা বিদেশে থাকিবেন তাঁহাদিগকে লিখিয়া জানাইতে বাধ্য থাকিবেন ও গ্রামের প্রকাশ্য জায়গায় হিসাব লটকাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন।

কার্য্য কারকেরা মাহিয়ানা পাইবেন না। তাঁহারা পুরস্কার স্বরূপ বৎসরের শেষে কিছু পাইবেন (তবে ৬৲ টাকা

হইতে অবস্থানুযায়ী ১২৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইবে না) কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের মতামত লওয়া হইবে।

যাঁহারা নিয়মাবলীতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিয়ম প্রতিপালন না করিবেন, তাঁহারা ধর্ম্মগোলা সম্বন্ধীয় যাবতীয় স্বত্বে (যত দিন পর্য্যন্ত না পুনঃ ক্ষতিপূরণ করিবেন) বঞ্চিত থাকিবেন। তাঁহাদের মত লওয়া হইবে না।

ইহার উদ্বৃত ধান্যে (তিন বৎসরের খোরাকী বাদে) সেচনাদির সুবিধার জন্য পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি হইবে।

যিনি কসাইদারকে—(সমর্থ হালের গরু ভিন্ন অন্য কোন) গরু বিক্রয় করিবেন তিনি সমাজচ্যুত হইবেন।

প্রত্যেকই নির্দ্দিষ্ট সময়ে পিঁজরা পোলে পাঠাইবার খরচা (যাহা নির্দ্ধারিত হইবে) দিয়া ধর্ম্মগোলায় নির্দ্দিষ্ট দিনে গরু পহুঁছিয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। গ্রাম্যফণ্ডের টাকার কিয়দংশ এই কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

গ্রাম্যফণ্ডের টাকা, যদি গোচর জমির খাজনা নির্দ্ধারিত থাকে তাহা হইলে ইহা হইতেই দেওয়া যাইবে। পোষ্ট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখিতে হইবে।

ধর্ম্মগোলা ও গ্রাম্যফণ্ডের পৃথক্ পৃথক্ হিসাব বহিতে সমস্তই লিখিত হইবে। ধর্ম্মগোলার উদ্বৃত টাকা হইতে কলের তাঁত শিক্ষা দেওয়া হইবে। যিনি ইহা হইতে কল্ সাহায্য লইবেন তাঁহাকে দুই বৎসরের মধ্যে ধর্ম্মগোলায় একখানি কল দিতে ও অন্য দুই ব্যক্তিকে এই কর্ম্ম শিক্ষা দিতে বাধ্য থাকিতে হইবে।

ধর্ম্মগোলার অর্থ অন্য কোনরূপে ব্যয়িত হইতে পারিবে না।

গ্রাম্যফণ্ডের টাকার অর্দ্ধাংশ উপরিলিখিত হিসাবে খরচ হইবে। বাকী অর্দ্ধাংশ গ্রামে চলিত নিয়মানুসারে ব্যয় হইতে পারিবে। একায়েক কেহই কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। পূজার সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়েই কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত বা রদ হইবে না।

যিনি নৈতিক ভাল কাজ করিবেন তিনি ইহা হইতে পুরস্কার পাইবেন। তাহাদের মতামত কার্য্য কারকদের পরেই গৃহীত হইবে। ভিন্ন গ্রামের লোকেরাও সৎকর্ম্মের জন্য এইরূপ দুইটী পুরস্কার পাইবেন।

এইরূপে আমাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান এবং ধীরে ধীরে শিল্পীকুলও মস্তকোত্তলন করিতে থাকিবে না কি ?

নিজেদের আবশ্যকমত নিয়ম গঠন করিয়া লইলেই হইল। তবে মোট কথা আমরা 'বাধ্য' হইতে জানি না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান—এই যা' ভয়। তবে এখন সকলে মিলিয়া না হইলেও যে কয়জনে একমত হইতে পারি সেই কয়জনে চেষ্টা করিলেও প্রতি গ্রামে ইহার প্রতিষ্ঠা করা বেশী কথা নয়। সকলেরই নিজ নিজ বাসগ্রামে ইহার প্রতিষ্ঠার্থে যত্নবান হওয়া উচিত। এমন পুস্তকে সমস্ত কথা প্রকাশ করা অসম্ভব ; যদি অবকাশ পাই বারান্তরে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। ইতি—

বিনীত
লেখক